Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরকের ভয়াবহতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ আবু হাসান শেখ

রোলঃ 227010557

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরকের ভয়াবহতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ আবু হাসান শেখ

রোলঃ 227010557

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " শিরকের ভয়াবহতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ আবু হাসান শেখ, আইডিঃ 227010557 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " শিরকের ভয়াবহতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মোঃ আবু হাসান শেখ

আইডিঃ 227010557

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, দুরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবি ও আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর। ইসলামী শরিয়তে শির্ক একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। এটি ইসলামের বিপরীত অর্থ বহন করে থাকে। আল্লাহকে ব্যতিরেকে তার সমকক্ষ সাব্যস্ত করাই হলো শির্ক।মানব জীবনে শির্ক খুবই মারাত্মক এক অপরাধ। কেউ শির্ক করলে তার সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম । নিম্নে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

শির্ক শব্দটি মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে একটি পরিচিত শব্দ। শির্কের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হয়ত অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই, আবার শির্কের বাস্তবতা বা শির্ক সংঘটনের বিভিন্ন বাস্তব পন্থা সম্পর্কেও অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। তাই সমাজের বিভিন্ন স্তরে শির্ক প্রচলিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষে সত্যের দিশারী রূপে যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাওহীদের বাণী প্রচার ও সত্যের আহ্বানের সাথে সাথে শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য ছিলেন সোচ্চার। প্রতিটি মানুষেরও ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে তাওহীদ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সেই সাথে অন্যদেরকেও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে শির্ক বর্জিত আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

জাতি হিসেবে আমরা শংকর জাতি। আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ রয়েছে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমাদের সমাজে ইসলামের মধ্যে বহু অনৈসলামিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ধর্মকে আমরা অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি, যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব। তাই প্রকৃত ইসলামের চেতনা আমাদের মধ্যে অনেকটাই অনুপস্থিত। আমরা শুধু পূর্ব পুরূষদের আচার আচরণের মধ্যেই ধর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতে শিখেছি। আমাদের সমাজের অনেক আলেমগণের অবস্থাও অনেকটা তদ্রূপ। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তারাও কোরআন ও হাদিসকে পাশ কাটিয়ে কিছু প্রচলিত পুস্তকের উপর নির্ভর করেই কোনভাবে চালিয়ে নিচ্ছে ধর্মীয় চর্চা। সেক্ষেত্রে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে, ফলে শির্কের মত কঠিন অপরাধগুলো সংঘটিত হয়ে চলছে।

এই লিখাতে কোরআনের কয়েকটি তফসীর গ্রন্থ যেমন, **তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীরে তাবারী, তাফসীর ফি-যিলালীল কোরআন, তাফসীরে আবু বকর জাকারিয়া** এবং সহীহ হাদিস গ্রন্থের মধ্যে **বোখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ, তিরমিযী শরীফ ও আবু দাউদ শরীফ সহ আর কিছু সহীহ হাদীস গ্রন্থের** সাহায্য গ্রহন করেছি। এ ছাড়াও ড. মোঃ সেলিম রেজা সম্পাদিত “**শিরক**”, ডঃ মুয্যাম্মিল আলী প্রনীত **‘শির্ক কি এবং কেন?’** মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত “**বড় শিরক কি ও কত প্রকার**”, নুরজাহানথবিনতেথআব্দুলথমজিদ সম্পাদিত “**শিরকের বেড়াজালে উম্মত বেসামাল**”, গ্রন্থগুলো ও ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রবন্ধের সহায়তা নিয়ে এ রচনাটি সম্পাদন করেছি। এ রচনার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রূটি থাকতে পারে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রূটি মার্জনা করেন এবং সবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট করূণা ভিক্ষা করছি।

শির্ক এর পরিচয়

শির্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ

ইবন মানযুর বলেছেন : 'আশ-শির্কাতু' ও 'আশ-শারকাতু' (الشِرْكَةُ وَ الشَّرْكَةُ) সমার্থবোথক দু'টি শব্দ। যার অর্থ : দু'শরীকের সংমিশ্রণ। তিনি আরো বলেন : 'ইশতারাকনা' (اشْتَرَكْنَا) আমরা শরীক হলাম শব্দের অর্থ : 'তাশারাকনা' (تَشَارَكْنَا) আমরা পরস্পর শরীক হলাম। দু'জন শরীক হলো আর পরস্পর শরীক হলো বা একে অপরের সাথে শরীক হলো কিংবা শরীক হওয়া, এ-সব শব্দের অর্থ 'আল-মুশারিক' (الْمُشَارِكُ) বা অংশীদার। 'আশ-শির্কু' (الشِّرْكُ) শরীক করাও শরীক হওয়ার মতই। এর বহু বচন হলো : 'আশরাক' ও 'শুরাকা-উ' '(أَشْرَاكٌ وَ شُرَكَاءٌ) অর্থাৎ : সকল শরীকান বা অংশীদার।

তিনি আরো বলেন : 'আশ-শির্কু' (اَلشِّرْكُ) শব্দটি 'আল-হিস্সাতু' (اَلْحِصَّةُ) : অংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : [مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِيْ عَبْدٍ...]''- ''যে তার কোন ক্রীতদাসের অংশকে মুক্ত করে দিল...।''[1] বলা হয়ে থাকে ''طَرِيْقٌ مُشْتَرَكٌ'' অর্থাৎ সম্মিলিত রাস্তা, যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। 'আশরাকা বিল্লাহি' (أَشْرَكَ بِاللهِ) সে আল্লাহর সাথে শরীক করলো, অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্বে কাউকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করলো।[2] (নাউযু বিল্লাহি)

وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣
অর্থ: স্মরণ কর, যখন লুকমান তার ছেলেকে নসীহত ক'রে বলেছিল- হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক কর না, **শিরক হচ্ছে অবশ্যই বিরাট যুলম। (সুরা লুকমান, আয়াত ১৩)**

আল-মুনজিদ নামক অভিধানে বলা হয়েছে : (أَشْرَكَ فِيْ أَمْرِهِ) অর্থাৎ- তার কাজে সে (অপর কাউকে) শরীক করে নিয়েছে। (أَشْرَكَ بِاللهِ) অর্থাৎ- সে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। আর যে তা করলো সে মুশরিক হয়ে গেল। [3]

শেখ যাকারিয়্যা আলী ইউছুফ বলেন :

‘‘কোন ক্ষেত্রে ‘শারাকতুহু’ ও আশ-রাকতুহু’ (شَرَكْتُهُ وَ أَشْرَكْتُه) তখনই বলা হয় যখন সে ক্ষেত্রে আমি কারো ‘শরীক’ (شَرِيْكٌ) অংশীদার হয়ে গেলাম, ‘শা-রাকতুহু’ (شَارَكْتُهُ) শব্দটিও শরীক এর অর্থ প্রকাশ করে।‘আশরাকতুহু’ (أَشْرَكْتُهُ) শব্দের অর্থ: আমি তাকে শরীক করে নিলাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي ٣٢ ﴾ [طه :٣٢]

(হে আল্লাহ) ‘‘তুমি হারূনকে আমার নবুওতের অংশীদার করে দাও।’’[4]

তিনি আরো বলেন: ‘শির্ক’ শব্দমূলটি সংমিশ্রণ ও একত্রিকরণের অর্থ প্রকাশ করে। কোন বস্তুর অংশ বিশেষ যখন একজনের হবে, তখন এর অবশিষ্ট অংশ হবে অপর এক বা একাধিকজনের। আল্লাহর বাণী :

﴿أَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٞ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ [فاطر :٤٠]

‘‘তবে কি আকাশমণ্ডলীতে তাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে’’[5] এ-আয়াতে বর্ণিত ‘শির্কুন’ শব্দের দ্বারা এ অংশীদারিত্বের অর্থই প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, একজন অংশীদার তার অপর অংশীদারের সাথে সংমিশ্রণকারী এবং তার অংশ অপরের অংশের সাথে মিলিত।আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে শিরক বলা হয়। সেটা একক স্রষ্টার মর্যাদার সাথে হোক, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর ইবাদত সমূহের সাথে হোক। এমনটা মনে করা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যরাও আহারদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক, ধনদৌলত, সন্তানাদী, উপকার অপকারের ক্ষমতা রাখে। ইবাদতগুলোর মধ্য হতে কোন ইবাদত অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দো‘আ, মানত কুরবানী, ভালবাসা, ভয়ভীতি, ইত্যাদি অন্য কারো জন্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে কোন ধরনের বিকৃতি বা অস্বীকৃতির মাধ্যমে শিরক করা। সমাজে বহু শিরকী কাজ চালু রয়েছে। যেমন মাযার

ও কবরপূজা, মাযারে শিরনী দেয়া, কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া, কবরে চাদর চড়ানো, ফুল দেয়া, মানত করা, তাবীয লটকানো, গায়রুল্লার নামে যবহ করা ও কসম করা ইত্যাদি।

শারঈ পরিভাষায় শিরক হল- আল্লাহর সাথে অন্য কোন অংশীদার বা সমকক্ষ নির্ধারণ করা; আল্লাহর রুবূবিয়্যতের ক্ষেত্রে কিংবা ইবাদতের ক্ষেত্রে কিংবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, কাজেই জেনে বুঝে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না। (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২২)

শিরক মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের শিরকের গোনাহ ক্ষমা করবেন না। তাওহিদের শ্রেষ্ঠ আহ্বান হলো শিরকে আকবর থেকে বিরত থাকা। কারণ সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করাই হলো শিরকে আকবর বা বড় শিরক।

শির্ক- এর পারিভাষিক অর্থ

ড. ইব্রাহীম আল-বুরাইকান শির্ক-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :
'শির্ক'-এর দু'টি অর্থ রয়েছে :
এক. সাধারণ অর্থ, আর তা হচ্ছে- গায়রুল্লাহকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ করা। সমকক্ষ বলতে এখানে মুক্ত শরীকানা বুঝানো হয়ে থাকে, শরীকানায় আল্লাহর অংশ গায়রুল্লাহের অংশের সমান হতে পারে অথবা আল্লাহর অংশ গায়রুল্লাহের অংশের চেয়ে অধিকও হতে পারে। তিনি আরো বলেন :

শির্কের উপর্যুক্ত সাধারণ অর্থের ভিত্তিতে শির্ক তিন প্রকার :

এক. আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শির্ক। এর সংজ্ঞা হচ্ছে- আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে সমকক্ষ করা অথবা কোনো বৈশিষ্ট্যকে তিনি ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন সৃষ্টি, জীবিকা, জীবন ও মৃত্যু ইত্যাদির সম্পর্ক অন্যের সাথে করা।

দুই. আল্লাহর উলূহিয়্যাতে শির্ক। এর সংজ্ঞা হচ্ছে- আল্লাহর উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে কাউকে সমকক্ষ করা। যেমন : সালাত, সাওম, পশু উৎসর্গকরণ ও মানত ইত্যাদি অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা।

তৃতীয়. আল্লাহ তা'আলার নামাবলী ও গুণাবলীতে শির্ক। এর সংজ্ঞা হচ্ছে- আল্লাহর নামাবলী ও গুণাবলীতে কোনো সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ করা।

শির্কের দ্বিতীয় অর্থ :
"আল্লাহর পাশাপাশি গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও মান্যবর হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন, সুন্নাহ ও অগ্রবর্তী মনীষীগণের কথায় শির্ক শব্দটি যখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর দ্বারা শির্কের দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।"[1]

আক্বীদার বিভিন্ন কিতাবাদিতে শির্ক-এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, তা অনেকটা ড. ইব্রাহীম বুরাইকান কর্তৃক বর্ণিত উপর্যুক্ত সংজ্ঞারই অনুরূপ।

শিরকের প্রকারভেদ

কুরআন কারীমের প্রায় এক তৃতীয়াংশ তাওহীদ ও শিরক বিষয়ক আলোচনা। হাদীস শরীফেও শিরকের আলোচনা ব্যাপক। স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহর আলিমগণও শিরক-কুফর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শিরকের প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য তারা শিরককে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। শিরকের ভয়াবহতা অনুসারে শিরকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(১) শিরক আকবার অর্থাৎ বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক এবং

(২) শিরক আসগার অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর শিরক।

তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে শিরককে **তিনভাগে** ভাগ করা হয়েছে।

আবার কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত শিরকী কর্মসমূহের ভিত্তিতে শিরককে অনেকভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

আমরা প্রথমে তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে শিরক আকবারের প্রকারভেদ ও শিরক আসগারের পরিচয় ও প্রকারভেদ আলোচনা করব।

এরপর শিরক প্রতিরোধে কুরআন-সুন্নাহর পদক্ষেপ আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

তাওহীদের বৈপরীত্যে শিরকের প্রকারভেদ

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের তিনটি পর্যায় রয়েছে। তাওহীদের বিপরীতই শিরক। এজন্য শিরককেও তিনভাগে ভাগ করা হয়:

প্রতিপালনের শিরক্ (الشرك في الربوبية)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, সংহার, প্রতিপালন, রিযক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। এখানে উল্লেখ্য যে, মহান আল্লার রুবূবিয়্যাত বা রুবূবিয়্যাতের কোনো বিষয় অস্বীকার করাও এ পর্যায়ের শিরক। কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা অন্য কোনো জাগতিক শক্তিকে রুবূবিয়্যাতের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে।

নাম ও গুণাবলির শির্ক (الشرك في الأسماء والصفات)

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। এসকল গুণ বা নামের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক। মহান আল্লাহকে কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় মনে করা এ পর্যায়ের শিরক।

ইবাদতের শিরক (الشرك في الألوهية)

'ইবাদত'-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করাকে 'ইবাদতের শির্ক' বলা হয়। ইবাদতের অর্থ আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইবাদত অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশা-মিশ্রিত চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় ও অসহায়তব প্রকাশ। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এরূপ অলৌকিক ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশই ইবাদতের শিরক।

শির্ক আস্গার (الشرك الأصغر)

যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে নি তাকে শিরক আসগার বলা হয়। যেমন আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে মানুষদের থেকে প্রশংসা, সুনাম বা জাগতিক কোনো কিছু আশা করা, অথবা এমন কথা বলা যাতে বাহ্যত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে মনে হতে পারে, যদিও বক্তার উদ্দেশ্য তা নয়।

আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত শির্ক হলো আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকার যুক্তিতে বা অন্য কোনো যুক্তিতে বিশ্ব পরিচালনায় কিছু অধিকার এবং ইবাদত লাভের অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা, এবং তার নিকট থেকে অলৌকিক সাহায্য, দয়া, বর, আশীর্বাদ বা নেকদৃষ্টি লাভের জন্য বা তার অলৌকিক ক্রোধ, অভিশাপ বা বিরক্তি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তার নিকট চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করা।

পক্ষান্তরে শির্ক আসগারের ক্ষেত্রে ইবাদতকারী কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ, রুবূবিয়্যাত বা উলূহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে না, তবে তার কর্ম ও কথা এরূপ বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায়। যে কোনো শিরক আসগর শিরক আকবরে পরিণত হতে পারে। কারণ মূল বিষয়টি নির্ভর করে উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের উপরে। শিরক আসগারের বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করলে উভয় পর্যায়ের শিরকের মধ্যে পার্থক্য আরো সুস্পষ্ট হবে।

শিরক আসগারের প্রকার ও প্রকাশগুলির মধ্যে অন্যতম রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা

রিয়া (الرياء) অর্থ দেখানো, প্রদর্শন করা (To act ostentatiously, make a show before people, attitudinize, to do eyeservice)। আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে।

মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করার জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ এই 'রিয়া'। কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়।[1]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রিয়াকে 'শিরক আসগার' অর্থাৎ 'ছোট শিরক' বা 'শিরক খাফী' অর্থাৎ 'লূক্কয়িত শিরক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য কিছু 'পুরস্কার' বা প্রশংসা আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত কবুল হবে না।

মাহমূদ ইবনু লাবীদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

"আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা।
কিয়ামতের দিন যখন মানুষদের তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের

কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কি না!"[2]

অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

"দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শির্ক। তা এই যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে।[3]

এখানে লক্ষণীয় যে, বান্দা যদি ইবাদতের ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ একমাত্র আল্লাহর জন্যই মনে করে, কেবল মানুষের কিছু প্রশংসা আশা করে তবে তা রিয়া বলে গণ্য হবে। আর যদি বান্দা কেবল মানুষের দেখানোর জন্যই ইবাদতটি করে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্রথম পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলেও ইবাদতটি পালন করবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলে ইবাদতটি পালনই করবে না।

[1] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫১৩।

[2] আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৪২৮-৪২৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২। হাদীসটির সনদ সহীহ।

[3] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৪০৬; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৮৯। হাদীসটি হাসান।

ওসীলা-উপকরণ বিষয়ক শিরক

মহান আল্লাহ এ বিশ্বের সবকছি একটি নির্ধারিত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন,

যাকে ‘সুন্নাতুল্লাহ’ বলা হয়। যেমন আগুনে পোড়া, বিষে মৃত্যু হওয়া, রৌদ্রে গরম হওয়া, পানিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগা, ঝড়ে বা প্রবল বাতাসে গাছপালা বা বাড়িঘর ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি। এরূপ কার্য-কারণ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই জানেন। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, সব কিছুর মূল কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও দয়া। জাগতিক এ নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে তা কাজ করে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিয়মের কার্যকারিত স্থগিত বা নষ্ট করতে পারেন। এরূপ বিশ্বাস সহ মুমিন বলতে পারেন, বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগেছে, বৃষ্টির কারণে ফসল ভাল হয়েছে, বিষের প্রভাবে তার মৃত্যু ঘটেছে, ঝড়ের কারণে গাছগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে, পচাবাসি খেয়ে পেট নষ্ট হয়েছে, ঔষধ খেয়ে শরীরটা ভাল লাগছে ... ইত্যাদি। এরূপ বলা কোনোরূপ অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না, যদিও মুমিন এ সকল ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর ইচ্ছার কথা সুস্পষ্ট বলতে ভালবাসেন। তবে যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই ঔষধ রোগ সারায়, বিষ মানুষ মারে, ঝড় গাছ ভাঙ্গে বা অনুরূপ কোনো বিশ্বাস যদি তিনি পোষণ করেন তবে তা ‘শিরক আকবার’ বলে গণ্য হবে।

আরেক প্রকার উপকরণ-ওসীলা আছে যা জাগতিক নয়, বরং বিশ্বাসের বিষয় মাত্র। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মে যে, বিশ্বের সকল বা বিশেষ কোনো কার্যের পিছনে অমুক কারণটি বিদ্যমান। অমুক কারণটি না হলে কার্যটি হতো না। যেমন একজন খৃস্টান বলতে পারেন, যীশুর ইচ্ছায় কাজটি হয়েছে, একজন হিন্দু বলতে পারেন, অমুক দেবী বা দেবতার করণে অমুক কাজটি হয়েছে। রাশির প্রভাবে বিশ্বাসী বলতে পারেন, অমুক রাশির প্রভাবে এ কাজটি হয়েছে।

জাগতিক উপকরণ এবং বিশ্বাসের উপকরণের মাধ্যমে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। জাগতিক উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী এবং সকল ধর্মের মানুষই একমত। কেউ যদি বলেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় লোকটির পেট নষ্ট হয়েছে তবে কেউ কথাটিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিবেন না, তবে বিশ্বাসী বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা ঘটেছে। পক্ষান্তরে বিশ্বাস ভিত্তিক উপকরণ-ওসীলাগুলি অন্য বিশ্বাসের মানুষের পাগলামি বলে হেসে উড়িয়ে দিবেন।

একজন মুমিন তার বিশ্বাসভিত্তিক উপকরণাদি জানা ও বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট শিক্ষার উপর নির্ভর করবেন। জাগতিক ভাবে যা কারণ, উপকরণ

বা ওসীলা নয় এবং কুরআন বা হাদীসে যাকে এরূপ উপকরণ বা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি তাকে কোনো কিছুর কারণ বা উপকরণ বলে উল্লেখ করলে তা বিশ্বাসের অবস্থা অনুসারে শির্ক আকবার বা শির্ক আসগার হতে পারে।

যেমন একজন মুমিন বলতে পারেন যে, যাকাত প্রদান না করার কারণে অনাবৃষ্টি হয়েছে, ওযনে, পরিমানে কম বা ভেজাল দেওয়ার কারণে জীবনযাত্রার কাঠিন্য ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, ন্যায় বিচার না থাকাতে দেশের উপর বিদেশী শক্তির প্রাধান্য বেড়েছে... যিক্র-ইসতিগফারের কারণে রিযকে বরকত এসেছে, ঈমান ও তাকওয়ার প্রসারতার কারণে দেশে শান্তি ও বরকত এসেছে....। মুমিন এগুলি বলেন এবং বিশ্বাস করেন যে, এগুলি সত্যিকার কারণ ও উপকরণ-ওসীলা। কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টত এগুলিকে এ সকল বিষয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু মুমিন বলতে পারেন না যে, অমুক রাশির প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে বা সুনামি হয়েছে বা অমুক রাশিতে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের ফলে অমুক বিষয়টি ঘটেছে। কারণ এগুলি কখনোই জাগতিক বৈজ্ঞানিক কার্যকরণের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং কুরআন-হাদীস নির্দেশিত কারণও নয়। বিশেষত প্রাচীন যুগের তারকা পূজারী বা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজারিগণ রশি বা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কথাগুলি তাদেরই কথা। যদি কেউ প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, রাশিচক্র ইত্যাদির নিজস্ব প্রভাব আছে বিশ্ব পরিচালনা ও বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সংঘটনের ক্ষেত্রে তবে তিনি শিরক আকবারে লিপ্ত প্রকৃত মুশরিক বলে গণ্য।

অনুরূপভাবে যদি কেউ মনে করেন আল্লাহর ইচ্ছাতেই এরূপ হয়, তবে আল্লাহ অমুক রাশি উপলক্ষে এরূপ করেন তবে তা শিরক আসগার পর্যায়ের কঠিন কবীরা গোনাহ বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত শিরকী কথা বলেছেন এবং আল্লাহর নেয়ামত অন্য কিছুর প্রতি আরোপ করেছেন। উপরন্তু তা আল্লাহর নামে কঠিন মিথ্যচার বলে গণ্য হবে। কারণ কখনো কোথাও অল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানান নি যে, এগুলি এরূপ বিষয়ের কারণ।

আর যদি কেউ পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে কথার মধ্যে এরূপ বলে ফেলেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, এগুলির একমাত্র পরিচালক আল্লাহ, রাশিচক্র বা অনুরূপ কোনো

কিছু এক্ষেত্রে কোনোরূপ দখল নেই, তবে তা 'শিরক আসগার' বলে গণ্য হবে, যা কঠিন কবীরা গোনাহ। কারণ তিনি মহান আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামতকে এমন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করেছেন যার সাথে এর কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। তিনি তার কথায় আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করেছেন।

যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে রাত্রিকালে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে সালাতুল ফাজর আদায় করেন। সালাত শেষ করে তিনি সমবেত মানুষদের দিকে মুখ করে বলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের রবব কি বলেছেন? তাঁরা বলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল উত্তম জানেন'। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

"আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ সকালে আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং কেউ আমার প্রতি কুফ্রী করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা আল্লাহর মহানুভবতা ও দয়ার কারণে বৃষ্টি পেয়েছি সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং গ্রহনক্ষত্রের প্রতি কাফির। আর যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা অমুক অমুক রাশির ফলে বৃষ্টি পেয়েছি তারা আমার প্রতি কুফরী করেছে এবং গ্রহনক্ষত্রে ঈমান এনেছে।"[1]

[1] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৯০, ২৫১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৮৩।

গাইরুল্লাহ'র নামে শপথ করা---

যাকে মানুষ অলৌকিকভাবে পবিত্র ও অলৌকিক জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার নামে কখনো মিথ্যা বলতে সে সম্মত হয় না। কারণ সে জানে যে, এদের নাম নিয়ে মিথ্যা বললে এদের অলৌকিক আক্রোশ বা অভিশাপ তার উপর পতিত হবে। এজন্য প্রাচীন যুগ থেকে সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে শপথের সত্যতা প্রমাণ করতে এরূপ অলৌকিক পবিত্র ও ভক্তিপূত নামের শপথ করা। কারো নামে শপথ করার সুনিশ্চিত অর্থ যে শপথকারী উক্ত নামের অধিকারী সত্তাকে উলূহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। 'গাইরুল্লাহ' বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা মূলত শিরক আকবার। উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, 'কাবা ঘরের কসম' বা কাবাঘরের নামে শপথ করাকে শিরক বলা হয়েছে এবং কাবা ঘরের প্রতিপালকের কসম করতে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে অনেক হাদীসে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

তবে যদি কোনো মুমিন নও মুসলিম হওয়ার কারণে অভ্যাস অনুসারে গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে ফেলে তবে তা 'শিরক আসগার' বলে গণ্য হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো আলিম।

এ বিষয়ে আল্লামা শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন, "কিছু মানুষের বিষয়ে মুশরিকগণ বিশ্বাস করত যে, এদের নামগুলি পবিত্র ও সম্মানিত। একারণে তারা বিশ্বাস করত যে, এদের নাম নিয়ে শপথ করলে সম্পদ ও সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। এজন্য তারা এদের নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ করত না। আর একারণেই তারা মামলা বিবাদে প্রতিপক্ষকে এ সকল কাল্পনিক শরীক 'উপাস্যে'-র নামে শপথ করাতো। ফলে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী করল বা শির্ক করল।"[1]

কোনো কোনো মুহাদ্দিস মতপ্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ প্রকৃত শিরক নয়, বরং

এরূপ করা কঠিন অন্যায় (শিরক আসগার) বুঝাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ বলেছেন। আমি এরূপ ব্যাখ্যা করছি না। আমার মতে এর অর্থ এই যে, যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামের মধ্যে 'পবিত্রতার' বা 'অলৌকিকতার' ও মঙ্গল-অমঙ্গলের 'আকীদা' পোষণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য বা মিথ্যা কসম করে তবে"[2]

[1] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১১০; আবূ দাউদ ৩/২২৩। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান।

[2] শাহ ওয়ালি উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ,, ১/১৮৭-১৮

আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা

এ পর্যায়ের শিরক আসগারের প্রকৃতি এই যে, জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোনো প্রকৃত 'কারণ'-কে মহান আল্লাহর পাশাপাশি এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে উভয় 'কারণ' সমান গুরুত্বের বলে মনে হয়। যেমন বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক কারণ। কেউ বলতে পারেন যে, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে। তবে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণেই হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন 'আল্লাহর ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ হয়েছে', তবে তা শিরক আসগর বলে গণ্য হবে। যদি বক্তা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা এবং বৃষ্টিপাত দুটিই স্বতন্ত্র কারণ তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি তিনি কথাচ্ছলে এরূপ বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তবে তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত অন্য একটি সাধারণ কারণকে মহান আল্লাহর সমতুল্য বলে প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে জাগতিক কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারণে উদ্ধারকৃত ব্যক্তি যদি বলে 'আল্লাহ এবং আপনি না হলে আমার বিপদ কাটত না' তবে তাও উপরের কথার মতই শিরক আকবার বা আসগার বলে গণ্য হবে।

জাগতিক-লৌকিক কোনো বিষয়ে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে বলতে পারেন 'এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে,' অথবা 'আপনি যা চাইবেন তাই হবে'। যেমন বিবাহ শাদি, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যদি বলেন: 'আল্লাহ ও আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা উপরের কথাগুলির মত শিরক আসগার বা আকবার বলে গণ্য হবে। যদি কেউ বলে, 'হে আমীর, হে সম্রাট, হে মন্ত্রী মহোদয়, আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা শিরক আকবার বা আসগার। তবে তিনি যদি বলেন, "হে সম্রাট বা আমীর, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এবং এরপর আপ&&ন যা ইচ্ছা করেন..." তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে না।

এখানে কয়েকটি পর্যায় লক্ষণীয়:

প্রথমত, মানবীয় ইচ্ছার পরিসর সকলেরই পরিজ্ঞাত। মানুষ তারা ইচ্ছাধীন বা কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর ইচ্ছার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের ইচ্ছা লৌকিক এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছা 'অলৌকিক' বা 'অপার্থিব'। সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে। তিনি 'হও' বললেই সব হয়ে যায়। এরূপ 'ইচ্ছা'-র অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ জাল্লা জালালুহু। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এরূপ 'অলৌকিক' ইচ্ছা আছে বা অন্য কাউকে মহান আল্লাহ খুশি হয়ে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেছেন তবে তা শিরক্ আকবার এবং মহান আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যাচার। মহান আল্লাহ কাউকে এরূপ ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলে কোথাও জানান নি। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, আরবের কাফিরদের শিরকের মূল ভিত্তি ছিল এরূপ চিন্তা। তারা নবী-ওলীদের মুজিযা-কারামত এবং ফিরিশতাদের দায়িত্ব ও সুপারিশগ্রহণ বিষয়ক ওহীর নির্দেশনাগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে এ সকল বিষয়কে তাদের অলৌকিক ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রদানের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করত। কেউ যদি এরূপ অর্থে বলে যে 'আল্লাহ এবং আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা শিরক আকবার এবং এর সংশোধনী হলো 'মহান আল্লাহ একাই যা চান তাই হবে, অন্যের ইচ্ছার মূল নেই।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি মানবীয় ইচ্ছা ও মহান আল্লাহর ইচ্ছার পার্থক্য অনুধাবন ও বিশ্বাস করার পরেও মানুষের ইচ্চাধীন কোনো বিষয়ের আলোচনায় বলেন: 'আল্লাহ এবং আপনি যা চান' অথবা বলেন 'আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান' এবং তার উদ্দেশ্য হয় যে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পুরো এখতিয়ার আপনার রয়েছে, তবে মহান আল্লাহর ইচ্চা সর্বোপরি কার্যকর, তবে তার এ কথাটি শিরক আসগর। তার বিশ্বাস সঠিক থাকলেও তার কথায় তার বিশ্বসের প্রতিফলন ঘটেনি। এক্ষেত্রে এরূপ বাক্যের সংশোধনী হলো 'আল্লাহ যা চান তাই হবে, অতঃপর আপনার ইচ্ছা' বা অনুরূপ বাক্য।

কাতীলা বিনতু সাইফী (রাঃ) বলেন,

إِنَّ حِبْراً جَاء إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ)فَقَالَ :إِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ، تَقُوْلُوْنَ :مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُوْلُوْنَ : وَالْكَعْبَةِ .فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ :(ﷺ)قُوْلُوا :مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ، وَقُوْلُوْا :وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

“একজন ইহূদী পন্ডিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমন করে বলেন, আপনারা তো শিরক করেন, কারণ আপনারা বলেন: ‘আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও’ এবং আপনারা বলেন: “কাবার কসম’। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমরা বলবে: ‘আল্লাহ যা চান, এরপর তুমি যা চাও’, এবং বলবে: ‘কাবার প্রতিপালকের কসম’।”[1]

হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ

“তোমরা বলবে না: ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুক যা ইচ্ছা করে’ বরং তোমরা বলবে: “আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করে।”[2]

তুফাইল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ (রাঃ) বলেন,

إِنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ لَقِيَ رَهْطاً مِنَ النَّصَارَى فَقَالَ :إِنَّكُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْمَسِيْحَ ابْنُ اللهِ .فَقَالُوا :وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ :مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ .قَالَ ثُمَّ لَقِيَ نَاساً مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ :إِنَّكُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ أَنَّ العُزَيْرَ ابْنُ اللهِ .فَقَالُوا :وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ :مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ .فَأَتَى النَّبِيَّ (ﷺ)فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): حَدَّثْتَ بِهَذا الْحَدِيْثِ أَحَداً؟ فَقَالَ :نَعَمْ .فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ :إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ رَأَى مَا بَلَغَكُمْ)وفي رواية أحمد :وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِيْ الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، وفي رواية عن حذيفة :قَدْ كُنْتُ أَكْرَهُهَا مِنْكُمْ (فَلاَ تَقُوْلُوْا :مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِنْ قُوْلُوا :مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

“তিনি স্বপ্নে কতিপয় খৃস্টানকে দেখে তাদেরকে বলেন, তোমরাই সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে, যদি না তোমরা বলতে ‘মাসীহ আল্লাহর পুত্র’। তখন তারা বলে, ‘তোমরাও সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে যদি না তোমরা বলতে: ‘আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান।’ এরপর তাঁর সাক্ষাত হয় একদল ইহূদীর সাথে। তিনি বলেন, তোমরাই সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে, যদি না তোমরা বলতে ‘উযাইর আল্লাহর পুত্র’। তখন তারা বলে, ‘তোমরাও সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে যদি না তোমরা বলতে: ‘আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান।’ তিনি বলেন, তখন

আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমন তাকে এ স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি কি এ বিষয়ে অন্যদেরকে জানিয়েছ? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি তখন আল্লাহর প্রশংসা করলেন তাঁর গুণবর্ণনা করলেন এবং বললেন: তোমাদের ভাই (তুফাইল) যে স্বপ্ন দেখেছে তা তোমরা জেনেছ। তোমরা এরূপ কথা বলতে যা আমি অপছন্দ করতাম, শুধু লজ্জার কারণে তোমাদের নিষেধ করি নি। তোমরা বলবে না: 'আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান'', বরং তোমরা বলবে: ''আল্লাহ একাই যা চান, তার কোনো শরীক নেই।''[3]

অন্য হাদীসে আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لاَ تَقُوْلُوْا :مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ .قُوْلُوْا :مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ.

''তোমরা বলবে না: ''যা আল্লাহ চান এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) চান' বরং বলবে: 'যা আল্লাহ একাই চান'।[4]

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন,

إِنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ :(ﷺ)مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ .فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ :(ﷺ)أَجَعَلْتَنِي وَاللَّهَ عَدْلا!؟)أَجَعَلْتَنِي لِله نِدًّا (بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ.

''এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলেন: ''আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন।'' তখন তিনি তাকে বলেন: ''তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে?! বরং আল্লাহর একার ইচ্ছাই চূড়ান্ত।''[5]

এখানে লক্ষণীয় যে, অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রে 'আল্লাহ যা চান অতঃপর আপনি যা চান' বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ হাদীসে 'একমাত্র আল্লাহ যা চান' বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে, সাহাবীগণ 'আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্দদ (ﷺ) যা চান', অথবা 'আল্লাহ যা চান, অতঃপর মুহাম্মাদ (ﷺ) যা চান' বলতেন তাঁর জীবদ্দশায়, যখন জাগতিকভাবে তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন পড়ত এবং তাঁরা তাঁর সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হতেন। বিশ্ব পরিচালনা

বা অলৌকিক ‘ইচ্ছা’ একামাত্র মহান আল্লাহরই। আমরা ইতোপূর্বে অগণিত আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে জেনেছি যে, কারো মঙ্গল, অমঙ্গল, বিপদ দান, বিপদ থেকে উদ্ধার, হেদায়াত করা, ঈমান আনানো, ধ্বংস করা ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কোনো ক্ষমতা, দায়িত্ব বা ঝামেলা আল্লাহ প্রদান করেন নি। এক্ষেত্রে একমাত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই। এজন্য আমরা দেখি যে, তাঁর ওফাতের পরে সাহাবীগণ তাঁর রাওযায় যেয়ে কখনোই বলেন নি যে, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ যা চান এবং এরপর আপনি যা চান, কাজেই আপনি্ আমাদের এ বিপদ বা অসুবিধা থেকে উদ্ধারের বিষয়ে ইচ্ছা গ্রহণ করুন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা। মূলত সকল কাজে তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এছাড়া মহান আল্লাহর নিকট তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) মর্যাদা অতুলনীয়। তিনি কিছু ইচ্ছা করলে মহান আল্লাহ তা রক্ষা করতেন। যেমন তিনি কাবাঘরকে কিবলা হিসেবে পেতে আগ্রহ বোধ করছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ আগ্রহ পূরণ করেন এবং কাবাকে কিবলা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে আয়াত নাযিল করেন।[6] কাজেই সাধারণভাবে অন্যান্য মানুষের ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে- টাকা প্রদান, চাকুরী প্রদান, জমি দান, শাস্তি মওকুফ ইত্যাদি বিষয়ে যেমন বলা যায় ‘হে আমীর বা হে নেতা, আল্লাহ যা চান এরপর আপনি যা চান’, তেমনিভাবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অনুরূপ বলায় কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কোনো কোনো বর্ণনায় এরূপ বলার অনুমতি তিনি সাহাবীগণকে দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসেই ‘একমাত্র আল্লাহ যা চান’ বলতে শিখিয়েছেন তিনি।

এর কারণ, সম্ভবত, জাগতিক রাজা, বাদশাহ, আমীর, সওদাগর নেতা বা অনুরূপ ব্যক্তি এভাবে আল্লাহর ইচ্ছার পরে তার নামটি উল্লেখ করলে তাতে আনন্দিত হন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন মহান আল্লাহর ইচ্ছার নিকট চিরসমর্পিত। আল্লাহর ইচ্ছা তিনি ওহীর মাধ্যমে অবগত হতেন এবং সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতেন। আর এরূপ প্রশংসা তিনি অপছন্দ করতেন।

শিরক আসগার জাতীয় এরূপ কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে: আমি আল্লাহর ও আপনার উপর নির্ভর করে আছি, উপরে আল্লাহ এবং নিচে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, আমার জন্য আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া কেউ নেই। আল্লাহ এবং আপনি না হলে কাজটি

হতো না, ইত্যাদি।

এ সকল ক্ষেত্রে যদি বক্তা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছার পাশাপাশি উক্ত ব্যক্তির ইচ্ছারও একইরূপ প্রভাব রয়েছে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি কথার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত এসে যায় এবং বক্তা বিশ্বাস করেন যে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর তবে তা শিরক্ আসগর বলে গণ্য হবে।

এভাবে আমরা দেখেছি যে, এ সকল ক্ষেত্রে অব্যয় ব্যবহারে এবং বাক্য গঠনে সতর্ক হতে শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। যেমন আল্লাহর ইচ্ছাতেই হলো আর এরপর ছিল আপনার চেষ্টা ... আল্লাহর জন্যই বেঁচে গেলাম, আর এরপর ছিল আপনার অবদান ...।

[1] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩৩১; নাসাঈ, আস-সুনান ৭/৬; আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/২৬৩। হাদীসটি সহীহ।

[2] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৯৫; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২১৬; আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/২৬৩-২৬৫। হাদীসটি সহীহ।

[3] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৫২৩; আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৭২, ৩৯৩;

ভবিষ্যদ্বক্তা বা ভাগ্যবক্তার কথায় বিশ্বাস করা

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। মহান আল্লাহ ছাড়া কারো ভবিষ্যতের জ্ঞান বা গাইবী জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করলে মহান আল্লাহর ইলমের বিশেষণে অন্যকে শরীক করা হয়। এজন্য ইসলামে গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিবিদ, হস্তরেখাবিদ বা অনুরূপ যে কোনো প্রকারের গোপন জ্ঞানের দাবিদার বা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দাবিদারের নিকট গমন করতে কঠিন ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ ব্যক্তির কথাকে সত্য বলে মনে করলে তা শিরক হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের হাদীসে আমরা তা দেখেছি। অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

(ﷺ)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

“যদি কেউ কোনো গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদের (ﷺ) উপর অবতীর্ণ দীনের প্রতি কুফরী করল।”[1]

অন্য হাদীসে সাফিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

“যদি কেউ কোনো গণক, গাইবী বিষয়ের সংবাদদাতা বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে ৪০ দিবস পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না।”[2]

যদি কেউ এরূপ জ্যোতিষী, গণক, রাশিবিদ, ফকীর ইত্যাদি গোপন জ্ঞানের দাবিদারকে সত্যই ‘গাইবী’ বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য। আর যদি বিশ্বাস করে যে, গোপন বা গাইবী জ্ঞান ও ভাগ্য বা ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কেউ তা জানে না বা জানতে পারে না, কিন্তু কৌতুহল বশত প্রশ্ন করে তবে তা কঠিন পাপ ও শিরক আসগর।

এখানে উল্লেখ্য যে, ‘ইলম দ্বারা চোর ধরা’ বা অনুরূপভাবে কুরআন, বা দু‘আর মাধ্যমে গাইবের কথা জানার চেষ্টা করাও ‘কাহানাত’ বলে গণ্য। কারো কিছু চুরি হলে তিনি চুরিকৃত দ্রব্য ফেরত পাওয়ার জন্য দু‘আ-তদবীর করতে পারেন। কিন্ত কে চুরি করেছে বা চুরি কৃত দ্রব্য কোথায় আছে তা জানার জন্য জাগতিক উপকরণ ছাড়া ‘গাইব’ জানার চেষ্টা করার কোনো সুযোগ নেই।

[1] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৪২৯; আলবানী, সাহীহুত তারগীব ৩/৯৭-৯৮।

রাশি, তাবিয ইত্যাদি ব্যবহার করা

বিভিন্ন হাদীসে তাবিজ, কবজ, রশি, সূতা, তাগা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি ব্যবহার শিরক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীসে ঝাড়-ফুঁক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ সকল হাদীসের সমন্বয়ের জন্য অনেক আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু'আ দ্বারা যেমন ঝাড়ফুঁক বৈধ, তেমনি এরূপ আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু'আ লিখে 'তাবিয' আকারে ব্যবহারও বৈধ। কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থবোধক দু'আ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক দেওয়া বৈধ, কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তাবীজ ব্যবহার কোনোভাবেই বৈধ নয়, কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। হাদীস শরীফে কুরআনের আয়াত বা ভাল দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেওয়া বৈধ বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে অনেককে ফুঁক দিয়েছেন। তবে তিনি নিজে বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো কাউকে তাবিজ লিখে ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না।
উকবা ইবনু আমির আল-জুহানী (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

"একদল মানুষ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাদের ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং একজনের বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একে পরিত্যাগ করলেন? তিনি বলেন, এর দেহে একটি তাবিজ আছে। তখন তিনি তার হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিড়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি তার বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বলেন: "যে তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল।"[1]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের (রাঃ) স্ত্রী যাইনাব (রাঃ) বলেন,

انَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ فَانْتَهَى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ ...وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَنَحْنَحَ قَالَتْ وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي مِنْ الْحُمْرَةِ فَأَدْخَلْتُهَا تَحْتَ السَّرِيرِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَرَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا قَالَ مَا هَذَا الْخَيْطُ قَالَتْ قُلْتُ خَيْطٌ أُرْقِيَ لِي فِيهِ قَالَتْ فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آلَ عَبْدِ اللَّهِ لأَغْنِيَاءُ عَنْ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)يَقُولُ :إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ)يَقُولُ أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

"ইবনু মাসঊদ (রাঃ) যখন বাড়িতে আসতেন তখন সাড়া দিয়ে আসতেন। ... একদিন তিনি এসে সাড়া দিলেন। তখন আমার ঘরে একজন বৃদ্ধা আমাকে ঝাড়ফুঁক করছিল। আমি বৃদ্ধাকে চৌকির নিচে লুকিয়ে রাখি। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসেন। এমতাবস্থায় তিনি আমার গলায় একটি সুতা দেখতে পান। তিন বলেন, এ কিসের সুতা? আমি বললাম, এ ফুঁক দেওয়া সুতা। যাইনাব বলেন, তখন তিনি সুতাটি ধরে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহর পরিবারের শিরক করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: "ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবজ এবং মিল-মহববতের তাবীজ শিরক।" যাইনাব বলেন, তখন আমি আমার স্বামী ইবনু মাসঊদকে বললাম, আপনি এ কথা কেন বলছেন? আল্লাহর কসম, আমার চক্ষু থেকে পানি পড়ত। আমি অমুক ইহূদীর কাছে যেতাম। সে যখন ঝেড়ে দিত তখন চোখে আরাম বোধ করতাম। তখন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন: এ হলো শয়তানের কর্ম। শয়তান নিজ হাতে তোমার চক্ষু খোচাতে থাকে। এরপর যখন ফুঁক দেওয়া হয় তখন সে খোচানো বন্ধ করে। তোমার জন্য তো যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলতেন তা বলবে। তিনি বলতেন: অসুবিধা দূর করুন, হে মানুষের প্রতিপালক, সুস্থতা দান করুন, আপনিই শিফা বা সুস্থতা দানকারী, আপনার শিফা (সুস্থতা) ছাড়া আর কোনো শিফা নেই, এমন (পরিপূর্ণ) শিফা বা সুস্থতা দান করুন যার পরে আর কোনো অসুস্থতা অবশিষ্ট থাকবে না।"[2]

তাবিয়ী ঈসা ইবনু আবি লাইলা বলেন,

دخلنا على عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقْتَ شَيْئًا فَقَالَ أَتَعَلَّقُ شَيْئًا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ)مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

“আমরা সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইম আবূ মা’বাদ জুহানীকে (রাঃ) অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেলাম। আমরা বললাম, আপনি কোনো তাবিজ ব্যবহার করেন না কেন? তিনি বলেন: আমি তাবিজ নেব? অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যদি কেউ দেহে (তাবিজ জাতীয়) কোনো কিছু লটকায় তবে তাকে উক্ত তাবিজের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়।”[3]

তাবিয়ী উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন:

دَخَلَ حُذَيْفَةُ τعَلَى مَرِيْضٍ فَرَأَى فِيْ عَضُدِهِ سَيْراً فَقَطَعَهُ أَو انْتَزَعَهُ ثُمَّ قَالَ :وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ

“সাহাবী হুযাইফা (রাঃ) একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যান। তিনি লোকটির বাজুতে একটি রশি দেখতে পান। তিনি রশিটি কেটে দেন বা টেনে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন[4], অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তারা শিরকে লিপ্ত থাকে।”[5]

[1] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১৫৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১০৩। হাদীসটির সনদ সহীহ। আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ১/৮০৯।
[2] আহমদ, আল-মুসনাদ ১/৩৮১; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৪১। হাদীসটির সনদ সহীহ।
[3] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৩১০; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪০৩; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/৩০০। হাদীসটি হাসান।
[4] সূরা ইউসূফের ১০৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি।

[5] ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৪৯৫।

শির্কে আকবর ও তার প্রকারভেদ

শির্ক আকবর (বড় শির্ক) তখন হবে যখন আপনি কাউকে আল্লাহর সমতুল্য বা সমকক্ষ (শরীক) স্থাপন করবেন। তাকে আপনি ডাকবেন; যেমন আল্লাহকে ডাকেন অথবা কোন প্রকার ইবাদত -যেমন বিপদে সাহায্য প্রার্থনা, যবেহ, ন্যর-নিয়াজ প্রভৃতি তার জন্য নিবেদন করবেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে মসউদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন পাপ সর্বপেক্ষা বড়?" উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার আল্লাহর সমকক্ষ স্থাপন করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সমকক্ষ অর্থাৎ সমতুল্য ও অংশীদার)।

শির্কে আকবরের প্রকারভেদ

১ দুআয় (প্রার্থনা ও ডাকার) শির্কঃ- রুজী অনুসন্ধান, রোগ নিরাময় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে আম্বিয়া, আওলিয়া ইত্যাদি গায়রুল্লাহকে ডাকলে বা প্রার্থনা করলে এই শির্ক হয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে আহবান করো না যে তোমার কোন উপকার করে না এবং অপকারও করে না। যদি তা কর, তাহলে তুমি যালেম (মুশরিক)দের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস ১০৬ আয়াত)

প্রিয় নবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে কোন শরীক (উপাস্য) কে ডাকা অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী)

আল্লাহ ব্যতীত মৃত বা জীবিতদেরকে (বিপদে) ডাকা বা তাদের নিকট কিছু প্রার্থনা করা (যা তাদের দেবার সাধ্য নেই) শির্ক। এ কথার দলীল আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

অর্থাৎ, এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা অতি তুচ্ছ। (খেজুরের আঁটির উপর পাতলা আবরণেরও) মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে আহবান করলে তোমাদের আহবান তারা শুনবে না, আর শুনলেও তোমাদেরকে সাড়া দেবে না। তোমাদেরকে কিছুও দান করতে পারে না)। কিয়ামতের দিন তোমাদের ঐ শির্ককে তারা অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞ। (আল্লাহর) ন্যায় তোমাকে কেউই অবহিত করতে পারবে না। (সূরা ফাতির ১৩-১৪ আয়াত)

২। আল্লাহর গুণাবলীতে শিকঃযেমন এই বিশ্বাস যে, আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ গায়েব (অদৃশ্যের খবর) জানেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

অর্থাৎ- তাঁর নিকটেই গায়েবের চাবি। তিনি ব্যতীত তা আর কেউ জানে। না। (সূরা আনআম ৫৯ আয়াত)

৩। মহব্বতের শির্কঃ তা হল, আওলিয়া প্রভৃতিকে এমন ভালোবাসা ও ভক্তি করা যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা ও ভক্তি করা হয়। এর দলীল আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

অর্থাৎ, কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর পরিবতে (তার) বিভিন্ন সমকক্ষ স্থির করে তাদেরকে এমন ভালোবাসে; যেমন আল্লাহকে বাসা হয়। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর ভালোবাসায় সুদৃঢ়। (সূরা বাক্বারাহ ১৬৫ আয়াত)

৪। আনুগত্যের শির্কঃ

তা হল বৈধ মনে করে আল্লাহর অবাধ্যাচরণে (নাফরমানী করে) উলামা (ইমাম) ও পীর-বুযুর্গদের আনুগত্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর পরিবর্তে ওদের পন্ডিত (পাদরী) ও সংসার বিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ ৩১ আয়াত)

ওরা ওদের এক প্রকার উপাসনা করত। যে উপাসনার ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে এবং তিনি যা হালাল করেছেন তা হারাম করে পাপ কাজে তাদের আনুগত্য করা।

মহানবী (সা.) বলেন, "স্রষ্টার অবাধ্যাচরণ করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" (সহীহ মুসনাদে আহমদ)

৫। সর্বেশ্বরবাদের শির্কঃ

অর্থাৎ এই বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে আবির্ভূত। এই বিশ্বাস দেমাঙ্কে সমাধিস্থ সুফী ইবনে আরাবীর। এমনকি সে বলেছে,

প্রভু তো দাস, আর দাস হল প্রভু,
হায় যদি আমি জানতে পারতাম, 'মুকাল্লাফ'
(শরীয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত) কে ?!'

সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ভিন্ন এক সুফী কবি বলেছে,

'কুকুর-শুকরও আমাদের উপাস্যই,
আল্লাহ তো গীর্জায় অবস্থানকারী পাদরীও!'(*)

৬ - নিয়ন্ত্রণকর্মের শির্কঃ এই বিশ্বাস যে, কিছু আওলিয়ার বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে, যারা বিশ্বকর্ম পরিচালনা করে থাকেন! যাঁদেরকে 'কুতুব' বলা হয়।

অথচ আল্লাহ তাআলা প্রাচীন মুশরিকদেরকে এই বলে প্রশ্ন করেন,

وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ

অর্থাৎ,---এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে?' তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ।' (সূরা ইউনুস ৩১আয়াত)।

৭- ভয়ের শির্কঃ

এই বিশ্বাস যে, কিছু মৃত অথবা অনুপস্থিত আওলিয়ার প্রভাব ও অনিষ্ট করার ক্ষমতা আছে যা ঐ বিশ্বাসীর মনে ভয় সঞ্চার করে ফলে ওদেরকে ভয় করে। এই বিশ্বাস ছিল মুশরিকদের। এর প্রতি সতর্ক করে কুরআন বলে,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ

অর্থাৎ, আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়। (সূরা যুমার ৩৬ আয়াত)

অবশ্য হিংস্র জন্তু এবং জীবিত কোন অত্যাচারী ব্যক্তি হতে প্রকৃতিগত ভয় শির্কের পর্যায়ভুক্ত নয়।

৮ - বিধান রচনার শির্কঃ

(৮) এই মতবাদে বিশ্বাসী জনৈক কবি এক জলাশয়ের প্রান্তে বসে থেকে দেখল যে,পদাপাতার উপর একটি ব্যাঙ বসে আছে। ইতিমধ্যে একটি সাপ তাকে আক্রমণ করতে চাইলে সে পানির মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। এ দৃশ্য দেখে সে গায়,

‘হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়,
হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়!’-অনুবাদক

যে ব্যক্তি ইসলাম-পরিপন্থী বিধান প্রণয়ন ও প্রচলন করে মানুষের মনগড়া কানুনকে মানা বৈধ মনে করে অথবা ইসলামী সংবিধানকে অচল ভাবে তার এই শির্ক হয়। এতে শাসক ও শাসনাধীন ব্যক্তি এবং বিচারক ও বিচারাধীন ব্যক্তি সকলেই এই শির্কের পর্যায়ভুক্ত হবে, যদি বিচারাধীন ব্যক্তি ঐ কানুনে বিশ্বাসী ও ঐ বিচারে সন্তুষ্ট হয় তবে।

৯ - শির্কে আকবর আমল বিধংস করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শির্ক কর তাহলে নিশ্চয় তোমার আমল (সৎকর্ম) নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা যুমার ৬৫ আয়াত)

১০। সম্পূর্ণরূপে শির্ক ত্যাগ করে তওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ শির্কে আকবরের পাপ ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সহিত শির্ক করার পাপ ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া অন্যান্য পাপ যার জন্য ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহর সহিত শির্ক করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (সূরা নিসা ১১৬ আয়াত)।

১১। শির্ক বহু প্রকারের। যার কিছু শির্কে আকবর এবং কিছু আসগর; যা থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজেব। রসূল ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেন এই দুআ করি,

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه و نستغفرك لما لا تعلم

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিন আন নুশরিকা বিকা শাইআন না'লামুহ, অনাস্তাগফিরুকা লিমা লা নালাম।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার সহিত আমাদের কোন জানা বিষয়ে শরীক করা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অজানা বিষয়ে শির্কের পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।)

]

গায়রুল্লাহকে আহবানকারীর উপমা

১। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

অর্থাৎ, হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ? তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তারা তো কক্ষনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না -যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে সকলে একত্রিত হয়। আবার মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু নিয়ে চলে যায়, তবে তাও তারা তার নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থী ও প্রার্থিত উভয়ই অক্ষম। (সূরা হজ্জ ৭৩ আয়াত)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সম্বোধন করে মহান উপমাটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে আদেশ করেন। তিনি বলেন, ঐ আওলিয়া, সালেহীন প্রভৃতিগণ; যাদেরকে তোমরা বিপদে সাহায্য লাভের জন্য আহবান করছ তারা তোমাদের সাহায্য করতে অক্ষম। বরং তারা কোনও এক সৃষ্টি যেমন একটি মাছিও সৃজন করতে অসমর্থ। আবার মাছি যদি তাদের খাদ্য অথবা পানীয়র কিছু অংশ নিয়ে চলে যেতে চায়, তবে তাও ফিরিয়ে আনতে তারা সক্ষম হবে না। এ তাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার এবং মাছিরও হীনতা ও ক্ষীণতার দলীল। সুতরাং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা তাদেরকে কি ভেবে আহবান করছ ? অত্র উপমায় তাদের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে যারা আম্বিয়া, আওলিয়া প্রভৃতি গায়রুল্লাহকে বিপদে ডেকে থাকে।

২। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

অর্থাৎ, সত্য আহবান তারই। যারা তাঁকে ব্যতীত অন্যকে আহবান করে ওরা তাদেরকে কোন সাড়াই দেয় না, তাদের দৃষ্টান্ত সেই (পিপাসার্ত) ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় এমন পানির দিকে প্রসারিত করে যা তার মুখে পৌছবার নয়। কাফেরদের আহবান তো নিষ্ফল। (সূরা রা'দ ১৪ আয়াত)

উক্ত আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, দুআ (আহবান ও প্রার্থনা), যা মুল ইবাদত তা একমাত্র আল্লাহরই জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত। ওরা যে। আল্লাহকে ছেড়ে অপরকে আহবান করছে তাতে ওরা ওদের নিকট কোন উপকার লাভ করবে না। আর ওল্লাও (গায়রুল্লাহ) ওদেরকে কোন প্রকার সাড়াও দেবে না, কোন সাহায্যও করতে পারবে না। তাদের উপমা সেই তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে এক কুঁয়ার উপর দন্ডায়মান থেকে হাত বাড়িয়ে পানি নিয়ে মুখে দেওয়ার অপচেষ্টা করে; যা তার সাধ্যে নয়। (যেহেতু সে পানি তার নাগালের বাইরে।)

মুজাহিদ বলেন, সে নিজের জিহ্বা দ্বারা পানিকে ডাকে এবং ইশারা করে কিন্তু পানি কক্ষনোই মুখে এসে পৌছে না।" (ইবনে কাসীর) অতঃপর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে ডাকে তাদের সম্পর্কে তিনি ফায়সালা দেন যে, তারা কাফের এবং তাদের ঐ আহবান ভ্রষ্টতা ও নিষ্ফল। যেহেতু তিনি বলেন, কাফেরদের আহবান তো নিষ্ফল।

অতএব ভাই মুসলিম! গায়রুল্লাহকে ডেকে কাফের ও ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে সাবধান হন। আর একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহকেই ডাকুন। এতে আপনি তওহীদবাদী মুমেনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

শির্ক দূরীকরণের উপায় :

তিন প্রকার শির্ক দূর না করে আল্লাহর সহিত শির্ক দূর করা সম্পন্ন ও সম্ভব হবে নাঃ

১। প্রতিপালকের কর্মসমূহে শির্কঃ

এই বিশ্বাস যে, আল্লাহর সহায়ক কোন ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা অথবা নিয়ন্তা আছে। যেমন কিছু সুফীপন্থী মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা কিছু বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ-ভার তার কিছু আওলিয়া ও কুতুবকে সমর্পণ করেছেন! যে বিশ্বাসের বিশ্বাসী প্রাক, ইসলাম যুগের মুশরিকরাও ছিল না। তাই তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেও তারা ওদের মত উত্তর দেয়নি। আল্লাহ বলেন,

وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ

অর্থাৎ, কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তারা বলবে, আল্লাহ।' (সূরা ইউনুস ৩১ আয়াত)
এক সুফী লেখকের বই 'আলকা-ফী ফিরদ্দি আলাল অহহা-বীতে পড়েছি, লেখক বলেন, 'আল্লাহর এমন অনেক বান্দা আছে যারা কোন কিছুর উদ্দেশ্যে হও' বললে সাথে সাথে তা হয়ে যায়! অথচ কুরআন তার এই কথার মিথ্যায়ন ও খন্ডন করে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

অর্থাৎ, তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন (তার প্রতি ইঙ্গিত করে) কেবল হও' বললে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন ৮২ আয়াত)
অন্যত্রে তিনি বলেন, (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) অর্থাৎ জেনে রাখ, সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দান কেবল তারই কাজ। (সূরা আরাফ ৫৪ আয়াত)

২। ইবাদত ও দুআতে শির্কঃ

আল্লাহর ইবাদত করা ও তাকে ডাকার সাথে সাথে অন্যান্য আম্বিয়া আওলিয়া ও সালেহীনদেরকেও ডাকা। যেমন তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা বিপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাদেরকে আহবান করা। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, এই শির্ক বর্তমান উম্মাহর মাঝে বহুল প্রচলিত। এই মহাপাপের অধিকাংশ বহন করবেন সেই পীর বুযুর্গ ও আলেমরা যারা অসীলার নামে এই ধরনের শির্ককে সমর্থন করে থাকেন এবং তাকে ভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকেন। যেহেতু অসীলা মানা হল কাউকে মাধ্যম করে আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করা। কিন্তু ওরা যা করে থাকে তা তো সরাসরি গায়রুল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা

করা। যেমন ওরা বলে, মদদ ইয়া রাসূলাল্লাহ!' 'মদদ ইয়া জীলানী! অথবা মদদ ইয়া বদবী!' (মদদ ইয়া খাজা! মদদ ইয়া আলী!) আর এই যাচনাই হল গায়রুল্লাহর উপাসনা। যেহেতু তা দুআ ও ফরিয়াদ। আর নবী (সা.) বলেন, "দুআই তো ইবাদত (উপাসনা)।" (তিরমিযী, এব তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। পক্ষান্তরে মদদ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাওয়া বৈধ নয়। তিনি বলেন,

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা মদদ (সমৃদ্ধ) করবেন। (সূরা নূহ ১২ আয়াত)

৩ শাসন ও বিচারের শির্কঃ ইবাদতের শির্কের পর্যায়ভুক্ত যদি শাসক বা বিচারক অথবা শাসনাধীন বা বিচারাধীন ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ও কানুনকে অচল মনে করে অথবা তার বিধান ও কানুন ব্যতীত অন্য বিধান ও কানুন অনুযায়ী শাসন ও বিচার বৈধ মনে করে।

৪। আল্লাহর গুণাবলীতে শির্কঃ

আল্লাহর কোন কোন সৃষ্টি যেমন আম্বিয়া, আওলিয়া প্রভৃতিকে আল্লাহ আযযা অজাল্লার বিশিষ্ট কোন কোন গুণ দ্বারা গুণান্বিত করা। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, গায়েবী খবর জানা। এই প্রকার শির্ক সূফীপন্থী এবং এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত লোকদের মাঝে ব্যাপক প্রচলিত। যেমন বুসীরী নবী (সা.) প্ল-এর প্রশংসা করে বলেছে, 'হে নবী (সা.) পৃথিবী ও তার অফুরন্ত সম্পদ তোমার বদান্যতারই অংশ, লওহে মাহফুয ও কলমের ইলমও তোমার অগাধ ইলমের অন্তর্ভুক্ত!! এখান হতেই কিছু ধর্মজী দাজ্জালদের ভ্রষ্টতার প্রাদুর্ভাব ঘটে। যারা ধারণা করে যে, তারা রসূল -কে জাগ্রতাবস্থায় দেখে থাকে এবং তাদের। সহচরবর্গকে তাদের কোন কোন বিষয়ে দায়িত্বভার দেবার পূর্বে তাকে ওদের অন্তস্তলের গুপ্ত রহস্য প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে। অথচ রসূল ঐ তার জীবদ্দশায় এ ধরনের রহস্য জানতে পারতেন না। যেমন তাঁর তরফ থেকে কুরআন বলে,

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

অর্থাৎ, আমি যদি গায়েব (অদৃশ্যের খবর) জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত। কল্যাণ লাভ করতাম এবং অকল্যাণ আমাকে স্পর্শই করত না। (সূরা আরাফ ১৮৮)

সুতরাং ইহকাল ত্যাগ করার পর এবং সুমহান বন্ধুর নিকট চলে যাওয়ার পর তিনি গায়েবের খবর কি রূপে জানতে পারেন? তিনি এক বালিকাকে যখন কবিতায় বলতে শুনলেন, "আমাদের মাঝে এমন নবী (সা.) আছেন; যিনি আগামীকালের অবস্থা জানেন।" তখন তিনি বললেন, "এই কথাটি ছেড়ে দাও (বলো না) বাকী যেগুলি বলছিলে সেগুলি বল।"

অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলগণকে কোন কোন গায়েবী বিষয়ে অবহিত করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

অর্থাৎ, তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের (গায়েবী) জ্ঞান। কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তার মনোনীত রসূল ব্যতীত। (সূরা জিন ২৬-২৭)

কিছু প্রচলিত শির্ক

বর্তমানে মুসলিম-বিশ্বে ব্যাপক আকারে প্রচলিত শির্কের সমারোহই মুসলিমদের দুর্দশা এবং ফিতনা ফাসাদ, ভূমিকম্প, যুদ্ধ প্রভৃতি আযাবে নিষ্পেষিত হওয়ার প্রধান কারণ। যা তাদের তওহীদ হতে বিমুখ এবং তাদের বিশ্বাস ও আচরণে শির্ক বহিঃপ্রকাশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে নানা প্রকার শির্কের ঘটা দেখা যায় যাকে বহু মুসলিম ইসলাম (বা ধর্ম) বলে মনে করে তা উক্ত কথারই প্রমাণ। আর তা ধর্ম মনে করে বলেই তারা তাকে মন্দ জানে না। অথচ তারা জানে যে, শিকী রীতি ও কর্মকে এবং শির্কের যাবতীয় অসীলা ও উপকরণকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব।

প্রধান প্রধান প্রচলিত শির্ক যেমনঃ

১। গায়রুল্লাহকে ডাকা (তাদের নিকট কিছু চাওয়া)। এই শির্কের বহিঃপ্রকাশ সাধারণতঃ অধিকাংশ নাত, গজল-গীতি ও কাওয়ালী প্রভৃতিতে ঘটে থাকে; যা নবী (সা.) দিবস, উরস এবং ঐতিহাসিক কোন স্মরণীয় দিবস উপলক্ষে আবৃত্তি করা ও গাওয়া হয়। আমি স্বয়ং ওদেরকে গাইতে শুনেছি,

‘হে রসূলদের ইমাম, হে আমার অবলম্বন!
আপনি আল্লাহর দরজা ও আমার ভরসাস্থল।
আমার ইহকালে ও আমার পরকালে
হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনি আমার হাত ধরুন।
আমার কষ্টকে স্বস্তিতে আপনি ব্যতীত
আর কেউ পরিণত করতে পারে না, হে সম্মানের মুকুট!

এ ধরনের স্তুতিবাদ যদি রসূলও শুনতেন তবে নিশ্চয় তিনি এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কষ্টকে স্বস্তিতে পরিণত করতে (মুশকিল আসান করতে) কেউই পারে না।। তদনুরূপ সেই সমস্ত গজল ও কবিতা যা পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে লিখা হয়, যাতে রসূল আওলিয়া এবং সালেহীনদের নিকট মদদ, সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করা হয় যা মঞ্জুর করতে তারা সক্ষম নন।

২। আওলিয়া ও সালেহীনদেরকে মসজিদে দাফন (সমাধিস্থ করা। সুতরাং অধিকাংশ মুসলিম দেশে আপনি প্রায় মসজিদে কবর দেখতে পাবেন, যার কিছুর উপরে কুব্বা, গম্বুজ বা মাযারও নির্মিত আছে। কিছু লোক আল্লাহকে ছেড়ে সে সমস্ত কবরের কাছে নিজেদের প্রয়োজন ভিক্ষা করে। অথচ রসূল (সা.) প্লঃ কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ

করেছেন। তিনি বলেন, “আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে অভিসম্পাত করুন; তারা তাদের আম্বিয়াদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।” (বুখারী ও মুসলিম)

অতএব আম্বিয়াগণকে যদি মসজিদে দাফন করা অবিধেয় হয় তাহলে কোন পীর বা আলেমকে তাতে দাফন করা কি করে বৈধ হতে পারে? পরন্তু বিদিত। যে, ঐ সমাধিস্থ ব্যক্তিকে আল্লাহর পরিবর্তে ডাকাও হতে পারে। যা শির্ক সংঘটনের কারণ হয়ে বসবে। অথচ ইসলাম শির্ক এবং তার দিকে পৌছে দেয় এমন সমস্ত উপায়-উপকরণকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৩। আওলিয়াদের নামে নযর মানা। কিছু লোক আছে, যারা অমুক অলীর নামে কোন পশু (মুরগী, খাসি বা শিরনী মিঠাই) ইত্যাদির নযর (মানত বা মানসিক) মেনে থাকে। অথচ এইরূপ ন্যর মানা শির্ক, যা পুরণ করা হারাম।। যেহেতু ন্যর মানা এক ইবাদত। যা একমাত্র আল্লাহর জন্য ও উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

অর্থাৎ, তারা তাদের ন্যর পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে যেদিনের ধ্বংসলীলা হবে ব্যাপক। (সূরা দাহর ৭ আয়াত)

৪। আম্বিয়া ও আওলিয়াদের কবর সমীপে পশু যবেহ করা যদিও নিয়ত আল্লাহর নামে ও উদ্দেশ্যেই যবেহ করা হয়। যেহেতু উক্ত কর্ম মুশরিকদের; যারা তাদের আওলিয়ারূপী মূর্তিসমূহের সন্নিকটে পশু যবেহ (বলিদান) করত।

রসূল 8 বলেন, “আল্লাহ তাকে অভিশাপ করেন, যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে।” (মুসলিম)

৫। আম্বিয়া এবং আওলিয়া যেমন; জীলানী, রিফায়ী, বদবী, হুসাইন (নিযামুদ্দীন, মুঈনুদ্দীন চিশতী, শাহ জালাল, খান জাহান, দাতা সাহেব) বা

অন্য কারো কবরের তওয়াফ করা। যেহেতু তওয়াফ করা এক ইবাদত। যা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবা শরীফকে কেন্দ্র করেই করা বিধেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)। অর্থাৎ, এবং তারা যেন প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে।” (সূরা হজ্জ ২৯ আয়াত)

৬। কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া। এরূপ অবৈধ। মহানবী (সা.) & বলেন, “তোমরা কবরের উপর বসো না এবং তার প্রতি সম্মুখ করে। নামায পড়ো না।”

৭। কবর দ্বারা বর্কত অর্জনের (তাবারুকের) উদ্দেশ্যে অথবা তার নিকট নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সফর (তীর্থযাত্রা) করা। এটাও বৈধ নয়। যেহেতু নবী (সা.) বলেন, “তিন

মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের প্রতি সফর করা হবে না; মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ (নববী) এবং মসজিদে আকসা।"

সুতরাং আমরা মদীনা নববিয়্যা যাবার ইচ্ছা করলে বলব, মসজিদে নববীর যিয়ারত ও নবী (সা.) এর প্রতি সালাম পড়তে মদীনা যাব।"

৮। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দ্বারা জীবনও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিচার-আচার করা। যেমন মানুষের মনগড়া কানুন দ্বারা বিচার করা যা কুরআন কারীম এবং সহীহ সুন্নাহর পরিপন্থী। যদি ঐ সমস্ত কানুন মান্য ও কার্যকর করা বৈধ মনে করে (তবে তা এক প্রকার কুফরী)।

তদনুরূপ সেই সমস্ত ফতোয়া যা কিছু উলামা প্রকাশ করে থাকেন অথচ তা ইসলামের স্পষ্ট উক্তির পরিপন্থী। যেমন (ইচ্ছাকৃত কোন ব্যাখ্যা না থাকা সত্ত্বেও) সুদ হালালের ফতোয়া। অথচ আল্লাহ সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

৯। কুরআন অথবা সহীহ সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তির পরিপন্থী বিষয়ে শাসক, রাষ্ট্রনেতা উলামা ও বুযুর্গদের আনুগত্য। যাকে 'শিকুতু-ত্বাআহ' (আনুগত্যের শির্ক) বলা হয়।* নবী (সা.) বলেন, "স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির জন্য আনুগত্য নেই।" (সহীহ মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থাৎ, ওরা ওদের পন্ডিতগণকে, সংসারবিরাগীদেরকে এবং মারয়্যাম তনয় মাসীহকেও আল্লাহর পরিবর্তে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ ওরা কেবল একই উপাস্যের উপাসনা করতে আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। ওদের শির্ক হতে তিনি পবিত্র। (সূরা তাওবাহ ৩১ আয়াত)।

উক্ত আয়াতে ইবাদত (উপাসনা)র ব্যাখ্যায় হুযাইফাহ (রাঃ) বলেন, "তা হল ইয়াহুদদের উলামারা যা তাদের জন্য হালাল করেছে অথবা হারাম করেছে। তাতে ওদের আনুগত্য করা।

* যদি অনুগত ব্যক্তি অবাধ্যতা ও পাপে তাদের আনুগত্য করার বৈধতার বিশ্বাসী হয়।

দুর্গা ও মাযার

বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে - যেমন, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে যে সব দুর্গা আমরা দেখতে পাই তা ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশের পরিপন্থী। যেহেতু নবী (সা.) ঐক্ত

কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, "রসূল (সা.) কবর চুনকাম করা, তার উপর বসা এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করা হতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম)

যে কোন প্রকার রং দ্বারা রঞ্জিত করা চুনকামের পর্যায়ভুক্ত।। তিরমিযীর এক সহীহ বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, "এবং কবরের উপর (কুরআনের আয়াত, কবিতা ইত্যাদি) লিখা হতেও তিনি নিষেধ করেছেন।"

১। এই মাযারসমূহের বেশীর ভাগই ঝুটা ও অলীক। সুতরাং হুসাইন বিন আলী ও ইরাকে শহীদ হন। তিনি (বা তার শবদেহ) মিসর পৌঁছেননি। অতএব মিসরে তাঁর কবর সত্য নয়। আর একথার বড় দলীল এই যে, ইরাক, মিসর ও সিরিয়ায় তার কবর বর্তমান! এবং দ্বিতীয় দলীল এই যে, সাহাবাগণ। মসজিদে কোন মৃত সমাধিস্থ করতেন না। কারণ রসূল (সা.) বলেন,"আল্লাহ

ইয়াহুদকে ধ্বংস করুন, তারা তাদের আম্বিয়াগণের কবর সমুহকে মসজিদরূপে গ্রহণ করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আর এর পশ্চাতে হিকমত ও যুক্তি এই যে, এতে মসজিদসমূহ শির্ক হতে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

অর্থাৎ, মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য কাউকেও আহবান করো না। (সূরা জিন ১৮ আয়াত)

প্রমাণসিদ্ধ যে, রসূল (সা.) তার স্বগৃহে সমাধিস্থ হয়েছেন, মসজিদে তাকে দাফন করা হয়নি। কিন্তু উমাবীরা যখন মসজিদ প্রশস্ত করেন তখন কবরকে মসজিদে শামিল করে নেন। হায়! যদি তারা একাজ না করতেন!

হুসাইন (রাঃ)-এর কবর বর্তমানে মসজিদের ভিতরে। কিছু লোক তার তওয়াফ করে এবং তার নিকট তাদের প্রয়োজন ভিক্ষা করে; যা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট চাওয়া যায় না। যেমন, রোগ নিরাময়, সঙ্কট দূরীকরণ প্রভৃতি। আমাদের দ্বীন আমাদেরকে এসব কিছু কেবল আল্লাহরই নিকট যাজ্ঞা করতে এবং শুধু কা'বারই তওয়াফ করতে আদেশ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) অর্থাৎ, এবং তারা যেন প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে। (সূরা হজ ২৯ আয়াত)

২। মিসর ও দামেস্কে সাইয়েদা যয়নাব বিনতে আলীর দর্গা সত্য নয়। কারণ তাঁর মুত্যু না মিসরে হয়েছে না সিরিয়ায়। এর দলীল এই যে, উভয় স্থানেই তার দর্গা বিদ্যমান রয়েছে!!

৩। কবরের উপর গম্বুজ বা কুব্বা নির্মাণে এবং সত্যি হলেও মসজিদের ভিতর কবর দেওয়ায় ইসলাম স্বীকৃতি জানায় না। যেমন ইরাকে হুসাইনের, বাগদাদে আব্দুল কাদের জীলানীর, মিসরের শাফেয়ীর কবর রয়েছে, যাতে ইসলামের অনুমতি নেই। যেহেতু এ বিষয়ে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা এসেছে - যেমন পুর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

এক সত্যবাদী আমাকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে কেবলার পরিবর্তে জীলানীর কবরের প্রতি সম্মুখ করে নামায পড়তে দেখলে তাঁকে নসীহত করেন। কিন্তু লোকটি তা উপেক্ষা করে তাকে বলে, তুমি ওয়াহাবী!' যেন সে রসূল (সা.)-এর এই বাণী শুনেনি, “তোমরা কবরের উপর উপবেশন করো না এবং তার প্রতি সম্মুখ করে নামায পড়ো না।” (মুসলিম)

৪। মিসরের অধিকাংশ দর্গাসমূহকে ফাতেমিয়্যাহ[১] নামক সরকার নির্মাণ করেছে। ইবনে কাসীর তাঁর গ্রন্থ্ আল-বিদায়াহ অন নিহায়াহ' **১১**খন্ডের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় তাদের প্রসঙ্গে বলেন, “(ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী) কাফের, ফাসেক, পাপাচার, ধর্মধ্বজী, ধর্মদ্রোহী, আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকারকারী ও ইসলাম অস্বীকারকারী মজুসী ধর্ম-বিশ্বাসী ছিল।”

ঐ কাফেরদল তখন শঙ্কিত হল যখন দেখল যে, সমস্ত মসজিদ নামাযীতে পরিপূর্ণ হচ্ছে অথচ তারা নিজেরা নামায পড়ে না, হজ্জ করে না এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাই তারা মানুষকে মসজিদ হতে বিমুখ করার জন্য ফন্দী আঁটল। নির্মাণ করল বহু গম্বুজ, দুর্গা এবং মিথ্যা মাযার; ধারণা করল যে, ঐ সবে হুসাইন বিন আলী এবং যয়নাব বিনতে আলী আছেন। দুর্গার দিকে মানুষকে আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান (উরস, মেলা প্রভৃতি) উদ্যাপন আরম্ভ করল। এবং নিজেদের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে গুপ্ত থেকে নিজেদের নাম 'ফাতেমী' রাখল। অতঃপর মুসলিমরা তাদের নিকট হতে ঐ সমস্ত বিদআত গ্রহণ করল, যা তাদেরকে শির্কে নিপতিত করল এবং ঐ সবের পশ্চাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে লাগল। অথচ তাদের দ্বীন ও সম্ভ্রমের প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করতে ঐ অর্থ তাদের একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।।

৫। মুসলিমরা যে অর্থ দর্গা, মাযার, আস্তানা প্রভৃতি নির্মাণের উদ্দেশ্যে খরচ করে থাকে তা মৃত (সমাধিস্থ) ব্যক্তির কোন উপকার সাধন করে না। অথচ ঐ অর্থ যদি তারা দরিদ্রদেরকে দান করত, তাহলে জীবিত ও মৃত সকলেই উপকৃত হত। পরন্তু বিদিত যে, কবরের উপর ইমারত নির্মাণকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে; যেমন পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মহানবী (সা.) আলী (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, “কোনও মুর্তি না ভেঙ্গে এবং কোন উচু কবর (ভূমি) বরাবর না করে ছেড়ো না।” (মুসলিম) (অর্থাৎ কোন সুউচ্চ কবর

না ভেঙ্গে এবং ভূমি বরাবর সমান না করে ছেড়ো।) অবশ্য চেনার জন্য কবরকে বিঘত পরিমাণ উঁচু করতে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে।।

৬। যে সমস্ত ন্যর-নিয়ায মৃতদের নামে পেশ করা হয় তা শির্কে আকবর। দর্গার খাদিমরা তা ভক্ষণ করে। হয়তো বা পাপাচারে ও প্রবৃত্তি পূজাতেও তা ব্যয় করে থাকে। যাতে ন্যর পেশকারী ও দাতা ঐ খাদিমের পাপের ভাগী হয়।

পক্ষান্তরে যদি সে ঐ অর্থ সকার নামে গরীবদেরকে দান করে, তাহলে মৃত ও জীবিত সকলেই উপকৃত হয় এবং সদকাদাতারও প্রয়োজন পূর্ণ হয়।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সত্যকে সত্যরূপে দেখাও এবং তার অনুসরণ করার প্রেরণা দাও ও তার প্রতি আমাদের মাঝে প্রেম সৃষ্টি কর। আর বাতিলকে বাতিলরূপে দেখাও এবং তা বর্জন করার প্রেরণা দাও ও তার প্রতি আমাদের মাঝে ঘৃণা সৃষ্টি কর।

[১]. এদের আসল নাম ‘উবাইদিয়ুন। উবাইদ বিন সা’দ এর প্রতি সম্বদ্ধ। ইবনে কাসীর এই নামটি তাঁর গ্রন্থ আল-বিদাআহ অন-নিহায়াহ’ (১১/৩৪৬) তে উল্লেখ করেছেন।

শির্কের বিপত্তি ও অপকারিতা

ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে শির্কের বহু সংখ্যক বিপত্তি ও অপকারিতা রয়েছে। যার মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিপত্তিগুলো নিম্নরূপঃ

১- শির্ক মানবতার অপমান। শির্ক মানুষের সম্মানহানি করে এবং তার কদর ও মর্যাদা অধঃপাতিত করে দেয়। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ বা সৃষ্টি করেছেন, তাকে যথার্থ মর্যাদা দান করেছেন, যাবতীয় বিষয়ের নাম শিক্ষা। দিয়েছেন, তাঁর তরফ হতে তিনি তার জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল বস্তুকে অধীনস্থ করে দিয়েছেন এবং এ বিশ্বচরাচরের সকল কিছুর উপর তাকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। কিন্তু সে আত্মমর্যাদা বিস্মৃত করে এই বিশ্বেরই কিছু

উপাদানকে নিজের পূজ্য উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে; যার সম্মুখে সে প্রণত ও অবনত হয়! এর চেয়ে মানুষের অধিক হীনতা আর কি হতে পারে যে, আজও পর্যন্ত কোটি-কোটি লোক গাভীর উপাসনা করে, যাকে আল্লাহ জীবিতাবস্থায় মানুষের সেবার জন্য এবং যবেহ করে তার মাংস ভক্ষণের জন্য সৃষ্টি করেছেন!

আবার কত শত মুসলিমকে আপনি দেখবেন তারা মৃতের কবরের উদ্দেশ্যে ধ্যানরত হয়। মৃতের নিকট নিজেদের প্রয়োজন ভিক্ষা করে। অথচ তারাও তাদেরই মত আল্লাহর দাস, যারা নিজেদের মঙ্গলামঙ্গলের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং হুসাইন (রাঃ) নিজের উপর থেকে হত্যা প্রতিহত করতে পারেন নি, অতএব অপরের নিকট থেকে বিপদ কিরূপে দূর করতে পারেন। এবং তার উপকার সাধন করতে পারেন?

পক্ষান্তরে পরলোকগত মানুষরা জীবিত মানুষদের দুআর মুখাপেক্ষী। সুতরাং আমরা তাদের জন্যই দুআ করব এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের নিকটে দুআ (প্রার্থনা) করব না বা বিপদে তাদেরকে আহবান করব না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে আহবান করে তারা কিছু সৃষ্টি করে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তারা নিপ্রাণ এবং তাদেরকে কবে পুনরুত্থিত করা হবে সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা নেই। (সূরা নাহল ২০-২১ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

অর্থাৎ, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করে সে যেন আকাশ হতে পড়ে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় অথবা বায় তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে। (সূরা হজ্জ ৩১ আয়াত)

২ - শির্ক কুসংস্কার ও অমুলক বিশ্বাসের বাসা।

কারণ যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে যে, এই বিশ্বে আল্লাহ ব্যতীত কোন নক্ষত্র, জিন, ব্যক্তিত্ব বা রূহেরও প্রভাব-ক্ষমতা আছে সে ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্ক প্রত্যেক কুসংস্কারকে স্থান দেবার জন্য এবং প্রত্যেক দাজ্জাল ও প্রতারক ধর্মধজীকে বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত থাকে। যার ফলে সমাজে শির্ক এবং আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না এমন গায়েবী (অদৃশ্য) খবরের দাবীদার গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর, জ্যোতিষী এবং অনুরূপ অন্যান্য মানুষদের বেসাতি বিস্তার লাভ করে। যেমন এই ধরনের পরিবেশে ঘটনার পশ্চাতে হেতু ও যুক্তি এবং সৃষ্টিগত নিয়মকে উপেক্ষা করার প্রবণতাও ব্যাপক আকার ধারণ করে।

৩ - শির্ক এক বড় অন্যায়। বাস্তবতা ও প্রকৃতত্বের প্রতি অন্যায়। যেহেতু সর্ববৃহৎ প্রকৃতত্ব এই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি ব্যতীত কেউ প্রতিপালক ও প্রভু নেই এবং তিনি ছাড়া কেউ বিধানদাতা ও শাসক নেই। কিন্তু মুশরিক গায়রুল্লাহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে এবং অপরকে বিধাতা মেনে থাকে।

শির্ক আত্মার প্রতি অন্যায়। যেহেতু মুশরিক নিজেকে তারই মত অথবা তার চেয়ে নিম্মমানের কোন সৃষ্টির দাস বানিয়ে দেয়। অথচ আল্লাহ তাকে স্বাধীনরূপে সৃষ্টি করেছেন। শির্ক অপরের প্রতি অন্যায়। যেহেতু যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কাউকে অংশী স্থাপন করে, সে ব্যক্তি ঐ অংশীর প্রতি অন্যায় করে, কারণ সে তাকে সেই অধিকার দান করে যা তার প্রাপ্য নয়।

৪। শির্ক ভয় ও অমূলক ধারণা এবং সন্দেহের উৎপত্তিস্থল। যেহেতু যে ব্যক্তি বিভিন্ন কুসংস্কার গ্রহণ করবে এবং অদ্ভুত কর্মকান্ড বিশ্বাস করে নেবে সে নানান দিক থেকে ভীত-শঙ্কিত হবে। কারণ সে একাধিক উপাস্য ও প্রভুর উপর ভরসা রাখে, যাদের প্রত্যেকটাই নিজেদের স্বার্থেও মঙ্গল আনয়ন এবং অমঙ্গল দূরীকরণে অসমর্থ। যার কারণে শির্কী পরিবেশে বাহ্যিক কোন কারণ ব্যতিরেকেই অশুভ ধারণা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ, কাফেরদের অন্তরে আমি আতঙ্ক সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সহিত শির্ক (অংশী স্থাপন করেছে যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। জাহান্নাম

তাদের নিবাস এবং অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট। (সূরা আলে ইমরান ১৫১ আয়াত)।

৫। শির্ক ফলপ্রসূ আমল (কর্ম) ব্যাহত করে। যেহেতু শির্ক তার অনুসারীদেরকে মাধ্যম ও সুপারিশকারীদের উপর ভরসা ও নির্ভর করতে শিক্ষা দেয়। ফলে তারা সৎকর্ম ত্যাগ করে বসে এবং পাপকর্মে লিপ্ত থাকে, আর বিশ্বাস এই রাখে যে, ওরা তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। এই বিশ্বাস ছিল ইসলামের পূর্বে আরবদের। যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থাৎ, এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা করে তা তাদের ক্ষতি করে না উপকারও করে না। (এই অন্যায় কাজের কৈফিয়ত হিসেবে) ওরা বলে, 'এগুলি আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।" বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান পবিত্র এবং ওদের শির্ক হতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। (সূরা ইউনুস ১৮)

ঐ খ্রিষ্টানরা, যারা বিশ্বাস রাখে যে, মাসীহকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয় যেমন ওরা মনে করে তখন তিনি তাদের সমস্ত পাপ স্খলন বা ক্ষমা করে গেছেন। ফলে তারা বিভিন্ন অসৎ ও নোংরা কর্ম এই বিশ্বাসে করে থাকে। কিছু মুসলিমও আছে, যারা ওয়াজেব কর্মাদি ত্যাগ করে ও হারাম কর্মাদি করে থাকে আর জান্নাত প্রবেশের জন্য তাদের রসূলের 'শাফাআত' (সুপারিশের) উপর ভরসা রাখে। অথচ রসূল কারীম (সা.) তার কন্যা ফাতেমার উদ্দেশে বলেন, "হে মুহাম্মাদের বেটী ফাতেমা! আমার সম্পদ হতে যা তোমার ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর দরবারে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" (বুখারী)

৬। শির্ক চিরকাল জাহান্নামে স্থায়ী হওয়ার কারণ। শির্ক পৃথিবীতে মানুষের ভ্রষ্ট হওয়ার এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী আযাব উপভোগের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সহিত শির্ক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করে দেবেন, তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং অনাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়েদাহ ৭২ আয়াত)

রসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে (স্থাপিত) কোন শরীককে ডাকা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নাম প্রবেশ করবে।" (বুখারী) উক্ত হাদীসে নিদ্দ্ (সমকক্ষ) এর অর্থ ও সমতুল ও অংশী।

৭। শির্ক উম্মাহকে বিচ্ছিন্ন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

অর্থাৎ, তোমরা মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না; যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। (সূরা রূম ৩১ আয়াত)*

(সারকথা)

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলি একথাই সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করে যে, শির্ক এমন এক ভয়ানক আপদ যা থেকে বাচা, সুদূরে থাকা এবং তাতে আপতিত হওয়ার ভয় করা ওয়াজেব। কারণ শির্ক সর্বাপেক্ষা বড় পাপ; যা বান্দার কৃত সমস্ত সৎকর্মকে পণ্ড ও ধ্বংস করে ফেলে -যে কর্ম জাতীয় কল্যাণ ও মানবিক সেবার উপযোগী হলেও হতে পারে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

অর্থাৎ, আমি ওদের (মুশরিকদের) কৃতকর্মের প্রতি অভিমুখ করে তা উড়ন্ত ধূলিকণার ন্যায় (নিষ্ফল) করে ফেলব। (সূরা ফুরকান ২৩ আয়াত)

(শায়খ আব্দুল্লাহ আব্দুল গনী খাইরাত্ব এর পুস্তক ‘‘দলীলুল মুসলিম ফিল ইতিকাদ’ হতে সমুদ্ভূত।)

* ডক্টর ইউসূফ কারযাবীর গ্রন্থ ‘হাক্বীক্বাতুত তাওহীদ’ হতে সংক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত।

বিধেয় অসীলা গ্রহণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যলাভের অসীলা (উপায় ও মাধ্যম) অন্বেষণ কর। (সূরা মায়েদাহ ৩৫ আয়াত)

কাতাদাহ (রঃ) বলেন, অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য এবং সন্তোষজনক আমল (কর্ম) করে তাঁর নৈকট্যলাভ কর। বিধেয় অসীলা কেবল মাত্র তাই, যার প্রতি কুরআন আমাদেরকে নির্দেশ করেছে, রসূল (সা.) যা বিবৃত করেছেন এবং সাহাবাগণ যা কার্যকর করে গেছেন। এই বিধেয় অসীলা বিভিন্ন প্রকার; যার প্রধান প্রধান নিম্নরূপঃ

১। ঈমানের অসীলা। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নিজ ঈমানের অসীলায় দুআ করার কথা উল্লেখ করে বলেন,

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

অর্থাৎ, (তারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! অতএব তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের গোনাহ মোচন কর এবং মৃত্যুর পর সৎলোকদের দলভুক্ত করো। (সূরা আলে ইমরান ১৯৩ আয়াত)

২। আল্লাহর তওহীদের অসীলা। যেমন মাছের পেটে ইউনুস আলাইহিস সালামের দুআ ঃআল্লাহ তাআলা বলেন,

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহবান করল, 'তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র! অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করলাম আর এভাবেই মুমিনদেরকে আমি উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া ৮৭-৮৮ আয়াত)

৩। আল্লাহর নামের অসীলা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

অর্থাৎ, আল্লাহর জন্যই উত্তম নামসমূহ, সুতরাং তোমরা তাঁকে সে সব নামেই আহবান কর। (সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)

আল্লাহর নামের অসীলায় রসূল (সা.)-এর দুআ, "হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রত্যেক নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি।" (তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহ)।

৪। আল্লাহর গুণের অসীলা। যেমন নবী (সা.) এর দুআ, "হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর! আমি তোমার রহমতের অসীলায় তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি।" (হাসান, তিরমিযী)

শায়খ রিফায়ী বলেন, 'আওলিয়াদের প্রতি আল্লাহর মহব্বতের অসীলায় তোমাদের প্রয়োজন আল্লাহর নিকট ভিক্ষা কর।"

৫। নেক আমল; যেমন, নামায, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, অধিকার রক্ষা, আমানতের হিফাযত, দান-খয়রাত, যিকর, কুরআন তেলাঅত, নবী (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ, তার প্রতি এবং তাঁর সাহাবার প্রতি আমাদের মহব্বত প্রভৃতির অসীলা।।

সহীহ মুসলিমে গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারী ৩ ব্যক্তির কাহিনীতে প্রমাণিত যে, তারা যখন গুহার মধ্যে (এক প্রস্তর দ্বারা) আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। তখন একজন

শ্রমিকের পারিশ্রমিক রক্ষা করে আদায় করা ও দ্বিতীয়জন পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার অসীলায় দুআ করলে আল্লাহ তাদেরকে বিপদমুক্ত করলেন।

৬। পাপাচার যেমন মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম কর্ম বর্জন করার অসীলায় আল্লাহর নিকট দুআ করা। যেমন উপযুক্ত গুহা-বন্দীদের তৃতীয় জন ব্যভিচার ত্যাগ করার অসীলায় দুআ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাদেরকে গুহা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু কিছু মুসলিম আছে, যারা নেক আমল করা এবং তার অসীলায় দুআ করা উপেক্ষা করে রসূল (সা.) ব্লক ও তার সাহাবার পথ ও নীতির বিপরীত চলে মৃত প্রভৃতি অপর ব্যক্তির আমলের অসীলার আশ্রয় গ্রহণ করে!!

৭ জীবিত আম্বিয়া ও সালেহীনদের নিকট দুআর আবেদন করে সেই অসীলায় দুআ। হাদীস শরীফে বর্ণিত যে, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী (সা.) -এর নিকট এসে বলল, "আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করেন। তিনি বললেন, "যদি তুমি চাও তোমার জন্য দুআ করব। নচেৎ যদি চাও ধৈর্য ধর এবং সেটাই তোমার জন্য শ্রেয়।" লোকটি বলল, 'বরং আপনি দুআ করুন।"

সুতরাং তিনি তাকে ওযু করতে বললেন এবং ভালোরূপে ওযু করে দু'রাকআত নামায পড়ে এই দুআ করতে আদেশ দিলেনঃ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তোমার নবী (সা.), দয়ার নবী (সা.)র সহিত তোমার অভিমুখ হচ্ছি। হে মুহাম্মদ! আমি আপনার সহিত আমার প্রতিপালকের প্রতি আমার এই প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে অভিমুখী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে তুমি এঁর সুপারিশ গ্রহণ কর এবং এর ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।"

বর্ণনাকারী বলেন যে, অতঃপর ঐ ব্যক্তি এরূপ করলে সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। (সহীহ মুসনাদে আহমাদ)

উক্ত হাদীসটি একথা স্পষ্ট করে যে, রসূল (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় ঐ অন্ধের জন্য দুআ করেছিলেন এবং আল্লাহও তার দুআ মঞ্জুর করেছিলেন। অনুরূপ তিনি ঐ লোকটিকে নিজের জন্য দুআ করতে এবং নবী (সা.)র দুআর সহিত আল্লাহর অভিমুখী হতে আদেশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তার নিকট হতে

তার আবেদন গ্রহণ করেন। সুতরাং এই দুআ তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁর মৃত্যুর পর অনুরূপ দুআ করা সম্ভব নয়। যেহেতু সাহাবাগণ এরূপ করেন নি। এবং এই ঘটনার পর অন্যান্য অন্ধ ব্যক্তিরা ঐ রূপ দুআ করে উপকৃত হয়নি।

অবৈধ অসীলা গ্রহণ

অবৈধ ও নিষিদ্ধ অসীলা তাই, যার কোন মূলভিত্তি দ্বীনে নেই। এই অবৈধ অসীলাও কয়েক প্রকারঃ

১। মৃত মানুষদের অসীলা। তাদের নিকট প্রয়োজন ভিক্ষা বা সাহায্য প্রার্থনা করা যেমন বর্তমান যুগের পরিস্থিতি। লোকে একে অসীলা মানা বলে থাকে, অথচ বাস্তব প্রেক্ষাপট তা নয়। যেহেতু অসীলা গ্রহণ হল বিধেয় মাধ্যম। যেমন ঈমান, নেক আমল এবং আল্লাহর সুন্দর ও পবিত্রতম নামাবলীর অসীলায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। কিন্তু মৃতদেরকে ডাকা তো আল্লাহ থেকে বিমুখতা প্রকাশ করা; যা শির্কে আকবরের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ, আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে আহবান করো না যে তোমার উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। যদি তা কর তাহলে তুমি সীমালংঘনকারী (মুশরিক)দের দলভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস ১০৬ আয়াত)

২। রসূলের মর্যাদার অসীলাঃ যেমন, হে প্রভু! মুহাম্মাদের মর্যাদার অসীলায় আমাকে আরোগ্য দান কর--' বলা বিদআত। কারণ সাহাবাগণ এমনটি করে যাননি। পক্ষান্তরে খলীফা উমর ও বৃষ্টি প্রার্থনার সময় আব্বাস (রাঃ)-এর জীবিতকালে তার দুআর অসীলা গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পরলোকগত রসূল (সা.)-কে অসীলা করে দুআ করেন নি।

প্রকাশ থাকে যে, "আমার মর্যাদার অসীলায় প্রার্থনা কর।" হাদীসটি ভিত্তিহীন;* যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ একথা উল্লেখ করেছেন।

পরন্তু এই বিদআতী অসীলা শির্কের পর্যায়েও পড়তে পারে। যেমন যদি বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ আমীর ও রাজাদের মত মাধ্যম ও মধ্যস্থতার মুখাপেক্ষী তবে তা শির্ক। কেন না এতে সে স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে বসে!

আবু হানীফা বলেন, গায়রুল্লাহর অসীলায় আল্লাহর নিকট চাওয়াকে আমি ঘৃণ্য আচরণ মনে করি।" (আদ-দুরুল মুখতার)

৩। রসূলের পরলোকগমনের পর তার নিকট দুআর আবেদন করা -যেমন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য দুআ করুন। এই বলা বৈধ নয়। কারণ সাহাবাগণ এরূপ করে যাননি। আবার যেহেতু রসূল ঐ বলেন, "মানুষ মারা গেলে তিনটি বিষয় ব্যতীত তার

সকল আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; প্রবাহমান সদকা (ইষ্টাপূর্ত কর্ম) ফলপ্রসূ ইলম এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।" (মুসলিম)

* তদনুরূপ হযরত আদম আলাইহিস সালামের তওবার সময় মুহাম্মদ (সা.) -এর অসীলায় প্রার্থনা করার হাদীসটিও জাল এবং গড়া হাদীস। -অনুবাদক

শিরক আকবর কারির পরিনতি

শিরক মানুষকে তাওহিদ তথা একত্ববাদ থেকে বের করে দেয়। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কখনো ক্ষমা করবেন না। তাদের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল।

(সুরা নিসা : আয়াত ৪৮)

এটা জানা আবশ্যক যে, যুলুম ও অবিচার তিন প্রকার। এক প্রকার যুলুম যা আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার যুলুম যা মাফ হতে পারে। আর তৃতীয় প্রকার যুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না। প্রথম প্রকার যুলুম হচ্ছে শির্ক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। [ইবন কাসীর] এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর বাইরে যত গোনাহ আছে সবই তিনি যার জন্যে ইচ্ছে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে সে অবশ্যই এক বড় মিথ্যা অপবাদ রটনা করল।

(তাফসির আবু বকর জাকারিয়া)

*মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٨٨

>> যদি তাঁরা (নবী রাসূলগণ) শিরক করতেন তবে অবশ্যই তাদের সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যেত।' (সুরা আনআ'ম : আয়াত ৮৮)
আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত দানসমূহ বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের একটি নিয়ম ব্যক্ত করা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন।" [মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৬৩] অপরদিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র সত্তা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তার সাথে অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংবা তার বিশেষ গুণে তার সমতুল্য মনে করা, তার ইবাদাতে অপর কাউকে শরীক করা শির্ক, কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, তোমরা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।
(তাফসির আবু বকর জাকারিয়া)

*মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

>> (হে নবি!) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহি করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করেন, তাহলে আপনার সব আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।' (সুরা যুমার : আয়াত ৬৫)

*মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ٧٢

>> তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'মরিয়মের ছেলে মসিহ-ই আল্লাহ। অথচ মসিহ বলেছিল, 'হে বনি ইসরাইল! তোমরা আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর। অবশ্যই যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেন। তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এ সব জালিমদের কেউই সাহায্যকারী নেই। (সুরা মায়িদা : আয়াত ৭২) এর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ প্রেরিত রাসূল- যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাত সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। কতক নবীকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে হত্যা করে ফেলে। আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহর নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে নবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্‌তে পরিণত করে দিয়েছে। তারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি তো মারইয়াম তনয় মসীহ' এ কথা বলে তারা কুফরী করল এবং কাফের হয়ে গেল। ইতিহাস বলে যে, যারা এ ধরণের উক্তি করত তারা হচ্ছে, নাসারাদের মালেকিয়্যা, ইয়া'কুবিয়্যা এবং নাসতুরিয়্যাহ সম্প্রদায়। [ইবন কাসীর] আলোচ্য আয়াতে যদিও এ উক্তিটি শুধু নাসারাদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র এ ধরণের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইয়াহুদী এবং নাসারা উভয়ের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে,

)وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ۚ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـــُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ قٰتَلَهُمُ اللهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (

অর্থাৎ ''আর ইয়াহুদীরা বলে, 'উযায়র আল্লাহর পুত্র', এবং খৃস্টানরা বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র।' এটা তাদের মুখের কথা। আগে যারা কুফরী করেছিল ওরা তাদের মত

কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। কোন্ দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে?” [সূরা আত-তাওবাহ ৩০] (তাফসির আবু বকর জাকারিয়া)

আলণ্ঢাহ্ তা’আলা ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকা হলেও তারা কখনো কারোর ডাকে সাড়া দিবেনা। বরং তাদেরকে ডাকা সর্বদা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হতে বাধ্য।

*আল্লাহ ঘোষণা করেন-

لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَـٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَـٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ ١٤

সত্যের আহ্বান তাঁরই। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে আহ্বান করে, তারা তাদেরকে কোনো কিছুতেই সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এ আশায় তার দুহাত মেলে ধরে পানির দিকে, অথচ তা তার মুখে পৌঁছার নয়, আর কাফিরদের আহ্বান তো কেবল ভ্রষ্টতায় নিপতিত
সুরা আর রাদ আয়াত ১৪

ডাকা মানে নিজের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য ডাকা। এর মানে হচ্ছে, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ এবং সংকটমুক্ত করার সব ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত। তাই একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা সঠিক ও যথার্থ সত্য বলে বিবেচিত। তাঁর আহ্বানই হক্ক আহ্বান। সে আহ্বানের মূল হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত হক্ক কোনো মা’বুদ নেই। (دَعْوَةُ الْحَقِّ) শব্দের তাফসীরে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে এটাই বর্ণিত আছে।

(তাফসিরে তাবারি)

যারা একমাত্র আলণ্ঢাহ্ তা’আলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে তাদেরকে আলণ্ঢাহ্ তা’আলা ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ড় বলে আখ্যায়িত করেছেন।

*মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ ٥

আর সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের আহ্বান সম্বন্ধেও গাফেল। (সুরা আল আহকাফ, ৫)

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ এই মুশরীকদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর- তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো এবং যাদের ইবাদত কর, তাদের কথা কিছু ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো? অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আকাশ হোক, পৃথিবী হোক, যে কোন জিনিসই হোক না কেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া কারো এক অণুপরিমাণ জিনিসেরও অধিকার নেই। সমগ্র রাজ্যের মালিক তিনিই। প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনি। তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক। সবকিছুরই উপর পূর্ণ অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। সুতরাং মানুষ তাঁর ছাড়া অন্যদের ইবাদত কেন করে? কেন তারা তাদের বিপদ-আপদের সময় অল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে? কে তাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে? কে তাদেরকে এ শিরক করতে শিখিয়েছে? প্রকতপক্ষে কোন সৎ ও জ্ঞানী মানুষের এ শিক্ষা হতে পারে না ।

মহান আল্লাহ তাদেরকে এ শিক্ষা দেননি। তাই তো তিনি বলেনঃ "পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' কিন্তু আসলে তো এটা তোমাদের বাজে ও বাতিল কাজ। সুতরাং তোমরা এর স্বপক্ষে না পারবে কোন শরীয়ত সম্মত দলীল পেশ করতে এবং না পারবে কোন জ্ঞান সম্মত দলীল পেশ করতে। এক কিরআতে وَاَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের হতে কোন সঠিক জ্ঞানের বর্ণনা পেশ কর। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ এমন কাউকেও উপস্থিত কর যে সঠিক ইলমের বর্ণনা দিতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ এই বিষয়ের কোন দলীল আনয়ন কর।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান-লিপি। বর্ণনাকারী বলেন যে, তাঁর ধারণামতে এ হাদীসটি মার'। হযরত আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বাকী ইলমকে বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'কোন গোপন দলীলও পেশ কর?' এই সব গুরুজন হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা পূর্ববতী লিপি উদ্দেশ্য। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর

দ্বারা কোন বিশেষ জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। এসব উক্তি প্রায় একই অর্থবোধক। ভাবার্থ ওটাই যা আমরা প্রথমে বর্ণনা করেছি। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ "ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। কেননা এগুলো তো পাথর এবং জড় পদার্থ। এরা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়।

কিয়ামতের দিন যখন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন এসব বাতিল মা'বুদ বা উপাস্য তাদের উপাসকদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তারা এদের ইবাদত অস্বীকার করবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ـ كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মাবুদ গ্রহণ করে এ জন্যে যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।"(১৯:৮১-৮২) অর্থাৎ যখন এরা তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিবে।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (সঃ) তাঁর উম্মতকে বলেছিলেনঃ

اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমাগুলোর সাথে যে পার্থিব সম্পর্ক স্থাপন করেছো এর ফলাফল তোমরা কিয়ামতের দিন দেখে নিবে, যখন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লা'নত করবে, আর তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।"(আল কুরআন)
(তাফসিরে ইবনে কাসির)

একমাত্র আলণ্ঢাহ্ তা'আলাই সকল লাভ-ক্ষতির মালিক। অন্য কেউ নয়। তিনি ইচ্ছে না করলে কেউ কারোর লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা। আর সকল কল্যাণাকল্যাণও কিন্তু মানব সাধ্যের আওতাধীন নয়। বরং তার অনেকটুকুই মানব সাধ্যাতীত। সুতরাং সকল ব্যাপারে তাঁকেই ডাকতে হবে

*মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧

আর আপনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ এটা করলে তখন আপনি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (১০৬) আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দিতে চান তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই, আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।(১০৭)

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি বলে দাও-- হে লোক সকল! আমি যে দ্বীনে হানীফ (একনিষ্ঠ ধর্ম) নিয়ে এসেছি, যার অহী আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যদি এর সঠিকতা ও সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হয়ে থাকে তবে জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের উপাস্যদের কখনো উপাসনা করবো না। আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই বান্দা, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন এবং যিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকেই তারই নিকট ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা, যদি ধরে নেয়া হয় যে, তোমাদের মা'বূদ সত্য, তবে তাদেরকে আমার কোন ক্ষতি করতে বলতো? জেনে রেখো যে, তাদের কারো লাভ বা ক্ষতি করার কোনই ক্ষমতা নেই। লাভ ও ক্ষতি করার হাত তো শরীকবিহীন আল্লাহর। হে নবী (সঃ)! তুমি কাফিরদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদতে লেগে যাও। শিরকের দিকে একটুও ঝুঁকে পড়ো না। যদি আল্লাহ তোমাকে ক্ষতির মধ্যে পরিবেষ্টন করেন, তবে কে এমন আছে যে, তোমাকে তা থেকে বের করতে পারে? লাভ ও ক্ষতি, কল্যাণ ও অকল্যাণ তো তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

*মহান আল্লাহ বলেন-

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡ ۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ٢٣

বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ্ মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা আসমানসমূহে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, যমীনেও নয়। আর এ দু'টিতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সহায়কও নয় (২২)আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, 'তোমাদের রব কী বললেন?' তার উত্তরে তারা বলে, যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন আর তিনি সমুচ্চ, মহান।(২৩)

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি এক ও একক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই। তিনি তুলনাবিহীন ও অংশীবিহীন। তাঁর কোন শরীক নেই, সাথী নেই, পরামর্শদাতা নেই, মন্ত্রী নেই এবং পরিচালক নেই। সুতরাং কে তাঁর সামনে হঠকারিতা করবে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করবে? তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ যাদের কাছে তোমরা আবেদন করে থাকো, জেনে রেখো যে, অণু পরিমাণও ক্ষমতা তাদের নেই। তারা শক্তিহীন ও অক্ষম। না দুনিয়ায় তাদের কোন ক্ষমতা চলে, না আখিরাতে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ

অর্থাৎ যাদেরকে তারা আল্লাহ ছাড়া ডাকে তারা খেজুরের ছালেরও মালিকানা রাখে না।"(৩৫:১৩) তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই এবং মালিকানার ভিত্তিতে কোন রাজত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজে তাদের কাছে কোনই সাহায্য গ্রহণ করেন না। অথচ তারা সবাই দরিদ্র, ফকীর ও অন্যের মুখাপেক্ষী। তারা সবাই গোলাম ও বান্দা। তার শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, ইজ্জত ও মর্যাদা এমনই যে, তার অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কেউ কারো জন্যে সুপারিশ করার সাহস রাখে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

অর্থাৎ "কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? (২:২৫৫) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَ كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِیْ شَفَاعَتُهُمْ شَیْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَرْضٰى

অর্থাৎ “আকাশের বহু ফেরেশতাও কারো সুপারিশের জন্যে মুখ খুলতে পারে না। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ স্বীয় সম্মতিক্রমে যার জন্যে অনুমতি দিবেন (তার জন্যে অরে)।”(৫৩:২৬) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَ لَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

অর্থাৎ তারা শুধু তারই জন্যে সুপারিশ করতে পারে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং তারা তাঁর ভয়ে কম্পমান থাকে।”(২১:২৮)
যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আদম-সন্তানের নেতা ও সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কিয়ামতের দিন যখন মাকামে মাহমূদে শাফাআতের জন্যে উপস্থিত হবেন এবং সবাই ফায়সালার জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট আসবে, ঐ সময়ের কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদায় পড়ে যাবো। কতক্ষণ যে আমি জিদায় পড়ে থাকবো তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। ঐ সিজদায় আমি আল্লাহ তা'আলার এতো প্রশংসা করবো যে, ঐ শব্দগুলো এখন আমার মনে হচ্ছে না। তখন আল্লাহ বলবেনঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! মাথা উঠাও এবং কথা বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি শাফাআত কর, কবূল করা হবে।” প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তিনি স্বীয় অহীর মাধ্যমে কথা বলেন, আর আকাশসমূহে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী। ফেরেশতারা তা শুনে থাকেন, তখন তাঁরা ভয়ে কেঁপে ওঠেন এবং তাদের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয় فُزِّعَ শব্দটি কোন কোন পঠনে فُرِّغَ ও এসেছে, দুটোরই ভাবার্থ একই। তখন তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এই সময় প্রতিপালকের কি হুকুম নাযিল হলো?” আহলে আরশ তাদের পার্শ্ববর্তীদের নিকট ধারাবাহিকভাবে ও সঠিকভাবে আল্লাহর আদেশ পৌছিয়ে থাকেন। এই আয়াতের একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন মৃত্যু-যাতনার সময় আসে তখন মুশরিক একথা বলে থাকে এবং অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনও বলবে যখন তাদের জ্ঞান ফিরবে তাদের দুনিয়ার গাফিলতির পর, অর্থাৎ দুনিয়ায় যে তারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূল (সঃ)-কে, আখিরাতকে ইত্যাদি সবকিছুকেই ভুলে ছিল, কিয়ামতের দিন যখন তাদের জ্ঞান ফিরবে এবং সব কিছু বুঝতে পারবে তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবেঃ “তোমাদের প্রতিপালক কি

বললেন?" উত্তরে বলা হবেঃ “যা সত্য তিনি তাই বলেছেন।” যে জিনিস হতে তারা দুনিয়ায় নিশ্চিন্ত থাকতো আজ সেটা তাদের সামনে পেশ করা হবে। তাহলে অন্তর হতে ভয় দূর হওয়ার অর্থ এই হলো যে, যখন তাদের চোখের উপর হতে পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে তখন তাদের পূর্বের সব সন্দেহ ও অবিশ্বাস মিটে যাবে এবং শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে, ঐ সময় তারা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত কথার সত্যতা স্বীকার করে নিবে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কথা মেনে নিবে। সুতরাং মৃত্যুর সময়ের স্বীকারুক্তিও কোন কাজে আসবে না এবং কিয়ামতের দিনের স্বীকারুক্তিতেও কোন লাভ হবে না। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মতে প্রথম তাফসীরই সঠিক। অর্থাৎ এটা ফেরেশতাদের উক্তি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। হাদীসে ও আসারেও এর উপরই জোর দেয়া হয়েছে। সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা কোন বিষয়ের ফায়সালা আসমানে করেন তখন ফেরেশতারা বিনয়ের সাথে তাদের ডানা ঝুঁকিয়ে থাকেন এবং প্রতিপালকের কালাম এমনই হয় যেমন ঐ শিকলের শব্দ, যা পাথরের উপর বাজানো হয়। যখন তাদের ভয় কমে আসে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞাসাবাদ করেনঃ “তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন?" উত্তরে বলা হয়ঃ “যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান।"

কোন কোন সময় জ্বিনেরা ফেরেশতাদের কথা শুনার জন্যে তাদের নির্ধারিত স্থানে গমন করে এবং চুরি করে কিছু শুনেও ফেলে। তাদের যারা উপরে থাকে তারা তাদের নীচে অবস্থানকারীদেরকে তা বলে দেয়। এভাবে ঐ কথাগুলো দুনিয়ায় চলে আসে এবং গণক ও যাদুকরদের কানে পৌঁছে যায়। ঐ শয়তান জ্বিনদেরকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু তার পূর্বেই কিছু কিছু খবর তারা দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দেয়। কখনো কখনো আবার খবর পৌঁছানোর পূর্বেই তারা জ্বলে পুড়ে যায়।

গণক বা যাদুকর দু' একটি ঐ সত্য কথার সাথে শত শতটি মিথ্যা মিলিয়ে জনগণের সামনে প্রচার করে। কাহেনের দু' একটি কথা যখন সত্য প্রমাণিত হয় তখন জনগণ তার মুরীদ হতে শুরু করে। তারা একে অপরকে বলেঃ “দেখো, এ কাজটি তার কথা অনুযায়ী হয়েছে।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের দলে বসেছিলেন। এমন সময় একটি তারকা খসে পড়লো, ফলে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “অজ্ঞতার যুগে এভাবে

তারকা ছিটকে পড়লে তোমরা কি বলতে?" সাহাবীরা জবাবে বললেনঃ "এ অবস্থায় আমরা বলতাম যে, হয়তো কোন বড় ও সম্ভ্রান্ত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে অথবা মারা গেছে। বর্ণনাকারী যুহরী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ অজ্ঞতার যুগেও কি এই ভাবে তারকা ঝরে বা ছিটকে পড়তো?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যা, তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের যুগেই এটা খুব বেশী হয়।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের ঐ কথার উত্তরে বললেনঃ "জেনে রেখো যে, কারো জন্ম বা মৃত্যুর সাথে ওগুলোর কোন সম্পর্কে নেই। কথা হলো এই যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যখন আকাশে কোন বিষয়ের ফায়সালা করেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাঁর তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। তারপর সপ্তম আকাশবাসী, এরপর ষষ্ঠ আকাশবাসী তাঁর মহিমা ঘঘাষণা করতে থাকেন। আর এভাবে শেষ পর্যন্ত এই তাসবীহ্ দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর আরশের আশে পাশের ফেরেশতারা আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কি বললেন?" তারা তখন তাঁদেরকে তা বলে দেন। এভাবে প্রত্যেক নীচের ফেরেশতা তাদের উপরের ফেরেশতাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করেন এবং তাঁদেরকে তা বলে দেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম আকাশে এ খবর পৌছে যায়। কখনো কখনো চুরি করে শ্রবণকারী জ্বিনেরা ওটা শুনে নেয়। তখন তাদের উপর তারকা ছিটকে পড়ে। এতদসত্ত্বেও যে কথা পৌঁছানোর ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা করেন, ওটা ঐ জ্বিন নিয়ে নেয় এবং ওর সাথে কহু কিছু মিথ্যা মিলিয়ে নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করে।" (এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কোন বিষয়ের অহী করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি অহীর মাধ্যমে কথা বলেন। সুতরাং যখন তিনি কথা বলেন তখন আকাশ ভয়ে কাপতে শুরু করে। আর ফেরেশতারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সিজদায় পড়ে যান। সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল (আঃ) মাথা উঠান এবং আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করেন। অতঃপর তার মুখে অন্যান্য ফেরেশতারা শুনেন এবং বলতে থাকেন যে, আল্লাহ সত্য বলেছেন। তিনি উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তিনি সমুচ্চ ও মহান।" (এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এটা হলো ঐ অহী যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে নবী-শূন্য যামানায় বন্ধ থাকে। অতঃপর খাতিমুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর নতুনভাবে নাযিল হওয়া শুরু হয়। প্রকৃত কথা এই যে, এই ইবতিদা বা নতুনভাবে শুরু হওয়াটাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে আয়াতটি এটাকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং অন্য সবকেও করে।

(তাফসিরে ইবনে কাসির)

সুতরাং দুনিয়া ও পরকালের সফলতা শিরকমুক্ত ঈমান ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ এ শিরক সম্পাদনকারী সম্পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর তা সরাসরি কুফরির নামান্তর। ফলে তার কোনো নেক আমল কাজে আসে না বরং সবই বিফলে যায়। তাই শিরকমুক্ত ঈমান লাভে তাওহিদের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনই ঈমানের একান্ত দাবি।

শিরক থেকে বাচার সুবিধার্থে প্রচলিত কিছু শিরকের উদাহরন

>> আল্লাহ তাআলাকে না ডেকে অন্য কাউকে ইবাদতমূলক আহ্বান ও সেজদা করা।

>> আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের নামে পশু জবাই বা কুরবানি করা।

>> আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে দুনিয়া ও পরকালের সব কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক জানা।

>> কাউকে ভবিষ্যতের অজানা অমঙ্গল দূরকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা।

>> আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সন্তান দানকারী হিসেবে মেনে নেয়া বা কারো কাছে সন্তান চাওয়া।

>> আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে ভাগ্য সুপ্রশস্তকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা।

মূল কথা হচ্ছে-

যে সব ইবাদত ও ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার জন্য খাস বা নির্ধারিত; সে সব বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মুখ, অন্তর, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিশ্বাস ও সেজদা করাই হলো শিরকে আকবর বা বড় শিরক।

নিচে সূফীদের কিছু বানানো কাহিনী উলেণ্ঢখ করা হলোঃ

১. একদা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী মুরগীর তরকারি খেয়ে হাড়গুলো পাশে রেখেছেন। অতঃপর হাড়গুলোর উপর হাত রেখে বললেনঃ আলণ্ঢাহ্'র আদেশে দাঁড়িয়ে যাও। ততক্ষণাতই মুরগীটি জীবিত হয়ে গেলো। (সীরাতে গাউস্, পৃষ্ঠাঃ ১৯১ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৪১১)

২. একদা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী জনৈক গায়কের কবরে গিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ আমার আদেশে দাঁড়িয়ে যাও। তখন কবর ফেটে লোকটি গাইতে গাইতে কবর থেকে বের হয়ে আসলো। (তাফরীজুল্ খা'ত্বির, পৃষ্ঠাঃ ১৯ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৪১২)

হযরত খাজা আবু ইস্হাক্ব চিশ্তী যখনই সফর করতে চাইতেন তখনই দু' শত মানুষকে সাথে নিয়ে চোখ বন্ধ করলেই সাথে সাথে গন্ড়ব্যস্থানে পৌঁছে যেতেন। (তা'রীখে মাশায়িখে চিশ্ত, পৃষ্ঠাঃ ১৯২ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৪১৮

৩. সাইয়েদ মাওদূদ চিশ্তী ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর প্রথম জানাযা মৃত বুযুর্গরা পড়েছেন। দ্বিতীয় জানাযা সাধারণ লোকেরা। অতঃপর জানাযাটি একা একা উড়তে থাকে। এ কারামত দেখে অগণিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। (তা'রীখে মাশায়িখে চিশ্ত, পৃষ্ঠাঃ ১৬০ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৭৪)

৪. খাজা 'উস্মান হার"নী দু' রাক'আত তাহিয়্যাতুল্ ওযু নামায পড়ে একটি ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে অগ্নিকু" ঢুকে পড়লেন। উভয়ে দু' ঘন্টা পর্যন্ড় সেখানে অবস্থান করেন। আগুন তাদের একটি পশমও জ্বালাতে পারেনি। তা দেখে অনেক অগ্নিপূজক মুসলমান হয়ে যায়। (তা'রীখে মাশায়িখে চিশ্ত, পৃষ্ঠাঃ ১২৪ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৫)

৫. জনৈকা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে খাজা ফরীদুদ্দীন গাঞ্জে শুক্‌রের নিকট এসে বললোঃ রাষ্ট্রপতি আমার বেকসুর ছেলেকে ফাঁসি দিয়েছে। এ কথা শুনে তিনি নিজ সাথীদেরকে নিয়ে ওখানে পৌঁছে বললেনঃ হে আলণ্ঢাহ্! যদি ছেলেটি বেকসুর হয়ে থাকে তাহলে আপনি তাকে জীবিত করে দিন। এ কথা বলার সাথে সাথেই ছেলেটি জীবিত হয়ে তাঁর সাথেই রওয়ানা করলো। তা দেখে এক হাজার হিন্দু মুসলমান হয়ে যায়। (আস্‌রার্ল আউলিয়া, পৃষ্টাঃ ১১০-১১১ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৬)

৬. জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল কাদির জিলানীর দরবারে একজন ছেলে সন্ড্রান ছেয়েছিলো। অতএব তিনি তাঁর জন্য দো'আ করেন। ঘটনাক্রমে লোকটির মেয়ে সন্ড্রান জন্ম নেয়। অতএব তিনি লোকটিকে বললেনঃ তাকে ঘরে নিয়ে যাও এবং কুদরতের খেলা দেখো। যখন লোকটি ঘরে ফিরলো তখন মেয়েটি ছেলে হয়ে গেলো। (সাফীনাতুল্ আউলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ১৭ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ২৯৯)

৭. হযরত আব্দুল কাদির জিলানী মদীনা যিয়ারত শেষে খালি পায়ে বাগদাদ ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে জনৈক চোরের সাক্ষাৎ হয়। লোকটি চুরি ছাড়তে চাচ্ছিলো। অতএব লোকটি গাউসে আ'জমকে চিনতে পেরে তাঁর পায়ে পড়ে বলতে শুর্ করলোঃ হে আব্দুল কাদির! আমাকে বাঁচান। তিনি তার এ অবস্থা দেখে তার উপর দয়ার্দ্র হয়ে তার ইস্‌লাহের জন্য আলণ্ঢাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন। গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো, তুমি চোরকে হিদায়াত করতে যাচ্ছো। তা হলে তুমি তাকে ক্বুতুব বানিয়ে দাও। অতএব চোরটি তাঁর এক দৃষ্টিতেই ক্বুতুব হয়ে গেলো। (সীরাতে গাউসিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৬৪০ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ১৭৩)

৮. মিয়া ইসমাঈল লাহোরী ফজরের নামাযের পর সালাম ফেরানোর সময় ডান দিকে দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের সকল মুসলণ্টী কোর'আন মাজীদের হাফিজ হয়ে যায় এবং বাম দিকের সকল মুসলণ্টী কোর'আন শরীফ দেখে দেখে পড়তে পারে। (হাদীক্বাতুল্ আউলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ১৭৬ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ৩০৪)

৯. খাজা আলাউদ্দীন সাবের কালীরিকে খাজা ফরীদুদ্দীন গাঞ্জে শুক্‌র "কালীর" পাঠিয়েছেন। এক দিন খাজা সাহেব ইমামের নামাযের জায়গায় বসে গেলেন। লোকেরা তাতে বাধা প্রদান করলে তিনি বললেনঃ ক্বুতুবের মর্যাদা কাজীর চাইতেও বেশি। অতঃপর সবাই তাঁকে জোর করে সেখান থেকে উঠিয়ে দিলে তিনি মসজিদে নামায পড়ার জন্য কোন জায়গা পাননি। তখন তিনি মসজিদকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ সবাই সিজদাহ্ করছে। সুতরাং তুমিও সিজদাহ্ করো। সাথে সাথে মসজিদটি ছাদ ও দেয়াল সহ ভেঙ্গে পড়লো এবং সবাই মরে গেলো। (হাদীক্বাতুল্ আউলিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৭০ শরীয়ত ও তরীক্বত, পৃষ্ঠাঃ ১৯৬)

১০. একদা কা'বা শরীফের প্রতিটি পাথর হযরত শায়েখ ইব্রাহীম মাত্‌বূলীর বড় শির্‌ক : কি ও কত প্রকার ৪১ চতুর্দিকে তাওয়াফ করে পুনরায় নিজ জায়গায় ফিরে আসে।

১১. হযরত ইব্রাহীম আল-আ'যাব সম্পর্কে বলা হয়, আগুনকে বেশি ভয় পায় এমন লোককে তিনি বলতেনঃ আগুনে ঢুকে পড়ো। এ কথা বলেই তিনি আগুনে প্রবেশ করে সেখানে দীর্ঘক্ষণ থাকতেন ; অথচ তাঁর জামাকাপড় এতটুকুও পুড়তো না এবং তাঁর কোন ক্ষতিও হতো না। এমনিভাবে তিনি নির্ভয়ে সিংহের পিঠে চড়ে এ দিক ও দিক ঘুরে বেড়াতেন।

১২. হযরত ইব্রাহীম আল-মাজ্যূব সম্পর্কে বলা হয়, তিনি কখনো কোন জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করলেই তা পূরণ হয়ে যেতো। তাঁর জামাগুলো গলা কাটা থাকতো। গলাটি সঙ্কীর্ণ হলে সকল মানুষই খুব কষ্টে জীবন যাপন করতো। আর গলাটি প্রশস্ড় হলে সকল মানুষই খুব আরাম অনুভব করতো।

১৩. হযরত ইব্রাহীম 'উস্বাইফীর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সাধারণত শহরের বাইরে গিয়ে নিচু ও গভীর জায়গায় ঘুমুতেন। বাঘের পিঠে চড়ে তিনি শহরে ঢুকতেন। পানির উপর দিয়ে তিনি হাঁটতেন। তাঁর নৌকার কোন প্রয়োজন ছিলো না।

১৪. হযরত ইব্রাহীম মাত্বূলী সম্পর্কে আরো বলা হয়, তিনি যখন কোন বাগানে ঢুকতেন তখন সেখানকার সকল গাছ ও উদ্ভিদগুলো নিজেদের সকল গুণাগুণ তাঁকে ডেকে ডেকে বলতো।

১৫. হযরত ইব্রাহীম মাত্বূলী সম্পর্কে আরো বলা হয়, তিনি কখনো মিসরে জোহরের নামায পড়তেন না। একদা জনৈক মুফতী সাহেব তাঁকে তিরস্কার করেন। অতঃপর তিনি ফিলিস্ড়িন সফর করে দেখেন, ইব্রাহীম মাত্বূলী রামালণ্ঢাহ্'র সাদা মসজিদে জেহরের নামায আদায় করছেন। মসজিদের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এ তো সর্বদা এখানেই নামায পড়ে।

১৬. শায়েখ ইব্রাহীম 'উরয়ান সম্পর্কে বলা হয়, যখন তিনি কোন শহরে ঢুকতেন তখন সেখানকার ছোট-বড়ো সবাইকে তিনি তাদের নাম ধরে ডাকতেন। যেন তিনি এখনকার দীর্ঘ দিনের বাসিন্দা। অতঃপর তিনি মিম্বরে উঠে উলঙ্গ অবস্থায় খুতবা দিতেন।

১৭. হযরত শায়েখ আবু 'আলী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি ছিলেন বহু রূপী। কখনো তাঁকে সৈন্য রূপে দেখা যেতো। আবার কখনো নেকড়ে বাঘ রূপে। কখনো হাতী রূপে। আবার কখনো ছোট ছেলের রূপে। তিনি মানুষকে মুষ্ঠি ভরে মাটি দিলে তা স্বর্ণ বা র‍ুপা হয়ে যেতো।

১৮. হযরত ইউসুফ আজ্মী সম্পর্কে বলা হয়, একদা হঠাৎ তাঁর চোখ একটি কুকুরের উপর পড়ে গেলে সকল কুকুর তার পিছু নেয়। কুকুরটি হাঁটলে সেগুলোও হাঁটে। আর কুকুরটি থেমে গেলে সেগুলোও থেমে যায়। মানুষ এ ব্যাপারটি তাঁকে জানালে তিনি কুকুরটির নিকট খবর পাঠিয়ে বললেনঃ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও। তখন সকল কুকুর কুকুরটিকে কামড়াতে শুর‍ু করলো।

অন্য দিন আরেকটি কুকুরের উপর তাঁর হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে সকল কুকুর আবার তার পিছু নেয়। তখন মানুষ কুকুরটির নিকট গেলে তাদের সকল প্রয়োজন সমাধা হয়ে যেতো। কুকুরটি একদা রোগাক্রান্ড় হলে সকল কুকুর একত্রিত হয়ে কাঁদতে শুর— করলো। তারা কুকুরটির জন্য আপসোস করতে লাগলো। একদা কুকুরটি মরে গেলে সকল কুকুর চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলো। আলণ্ঢাহ্ তা'আলার ইলহামে কিছু মানুষ কুকুরটিকে দাপন করে দিলো। কুকুরগুলো যতোদিন বেঁচে ছিলো তারা উক্ত কুকুরটির যিয়ারত করতো।

১৯. হযরত আবুল খায়ের মাগরিবী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি একদা মদীনায় গেলেন। তিনি পাঁচ দিন যাবত কিছুই খাননি। নবী , হযরত আবু বকর ও 'উমর (রাযিয়ালণ্ঢাহু আন্হুমা) কে সালাম দিয়ে তিনি রাসূল কে আবদার করে বললেনঃ হে আলণ্ঢাহ্'র রাসূল ! আমি আজ রাত আপনারই মেহমান। এ কথা বলে তিনি মিম্বরের পেছনে শুয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখেন স্বয়ং রাসূল হযরত আবু বকর, 'উমর ও 'আলী কে নিয়ে তাঁর সামনেই উপস্থিত। হযরত আলী তাঁকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললেনঃ উঠো, রাসূল এসেছেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে রাসূল এর দু' চোখের মাঝে চুমু খেলেন। রাসূল তাঁকে একটি র—টি দিলেন। যার অর্ধেক তিনি স্বপ্নে খেয়েছেন। আর বাকি অর্ধেক ঘুম থেকে উঠে নিজের হাতেই দেখতে পেলেন।

২০. বায়েযীদ বোস্ড়ামী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি এক বছর যাবত ঘুমাননি এবং পানিও পান করেননি।

২১. শায়েখ মুহাম্মাদ আহ্মাদ ফারগালী সম্পর্কে শুনা যায়, একদা একটি কুমির মুখাইমির নাক্বীবের মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেনঃ যেখান থেকে তোমার মেয়েটিকে কুমির ছিনিয়ে নিলো সেখানে গিয়ে উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বলবেঃ হে কুমির! ফারগালীর সাথে কথা বলে যাও। তখন কুমিরটি সাগর থেকে উঠে সোজা ফারগালীর বাড়িতে চলে আসলো। আর মানুষ তা দেখে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিলো। তখন তিনি কামারকে বললেনঃ এর দাঁতগুলো উপড়ে ফেলো। তখন সে তাই করলো। অতঃপর তিনি কুমিরকে মেয়েটি উগলে দিতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটি জীবিতাবস্থায় কুমিরের পেট থেকে বের হয়ে আসলো। তখন তিনি কুমিরটিকে এ মর্মে অঙ্গিকার করালেন যে, যতোদিন সে বেঁচে থাকবে কাউকে আর এ এলাকা থেকে ছিনিয়ে নিবে না। তখন কুমিরটি কাঁদতে কাঁদতে সাগরের দিকে নেমে গেলো।

২৩. শায়েখ আব্দুর রহীম ক্বান্নাভী সম্পর্কে বলা হয়, একদা তাঁর বৈঠকে আকাশ থেকে একটি মূর্তি নেমে আসলো। কেউ চিনলো না মূর্তিটি কি ? ক্বান্নাভী সাহেব কিছুক্ষণ পর্যন্ড় তাঁর মাথাটি নিচু করে রাখলেন। অতঃপর মূর্তিটি উঠে গেলো। লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ একজন ফিরিশ্তা দোষ করে বসলো। তাই সে আমার নিকট সুপারিশ কামনা করলো। আমি সুপারিশ করলে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তা কবুল করেন। অতঃপর ফিরিশ্তাটি চলে গেলো।

২৪. সাইয়েদ আহ্মাদ স্বাইয়াদী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি যখনই নদীর পাড়ে যেতেন তখন নদীর মাছগুলো তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তো। কোন মর—ভূমি দিয়ে তিনি চলতে থাকলে সকল

পশু তাঁর পায়ে গড়াগড়ি করতো। এমনকি তাঁর স্বাভাবিক চলার পথেও রাস্ড়ার দু’ পার্শ্বে পশুরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতো। তাঁর সম্পর্কে আরো বলা হয়, তিনি একটি সিজ্‌দায় পূর্ণ একটি বছর কাটিয়ে দিলো। একটি বারের জন্যও তিনি সিজ্‌দাহ্ থেকে মাথাটি উঠাননি। যার দর"ন তাঁর পিঠে গাস জন্মে গেলো।

২৫. সাইয়েদ বাদাভী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি আলণ্ডাহ্ তা’আলার নিকট তিনটি দো’আ করেন। যার মধ্যে দু’টি দো’আ আলণ্ডাহ্ তা’আলা কবুল করেছেন। আরেকটি দো’আ কবুল করেননি। তিনি আলণ্ডাহ্ তা’আলার নিকট এ মর্মে দো’আ করেছেন যে, কেউ যদি তাঁর কবর যিয়ারত করে তা হলে আলণ্ডাহ্ তা’আলা যেন তার ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে যে কোন সুপারিশ কবুল করেন। আলণ্ডাহ্ তা’আলা তা কবুল করলেন। তিনি আলণ্ডাহ্ তা’আলার নিকট এ মর্মেও দো’আ করেছেন যে, কেউ যদি তাঁর কবর যিয়ারত করে তা হলে আলণ্ডাহ্ তা’আলা যেন তাকে একটি হজ্জ ও একটি ’উমরাহ্’র পূর্ণ সাওয়াব দেন। আলণ্ডাহ্ তা’আলা তাও কবুল করলেন। তিনি আলণ্ডাহ্ তা’আলার নিকট এ মর্মেও দো’আ করেছেন যে, আলণ্ডাহ্ তা’আলা যেন তাঁকে জাহান্নামে প্রবেশ করান। আলণ্ডাহ্ তা’আলা কিন্তু তা কবুল করলেন না। লোকেরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ আমি যদি জাহান্নামে ঢুকে গড়াগড়ি করি তা হলে জাহান্নাম সবুজ বাগানে পরিণত হবে। আর আলণ্ডাহ্ তা’আলার তো এ অধিকার অবশ্যই রয়েছে যে, তিনি কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের যথাযথ শাস্ড়ির ব্যবস্থা করবেন।

(বড় শির্ক কি ও কত প্রকার, সম্পাদনায় ঃ মোস্ড়ফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ)

ছোট শিরক

শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সদকা করল সে শির্ক করল।’ [মুসনাদে ত্বায়ালেসী ১১২০, মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৩৬৫]

শির্কে আকবর নয় এমন যে সব কর্মকে শরীয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শির্ক বলা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগর বা ছোট শির্ক। একজন মানুষ তাওহীদবাদী হওয়া সত্বেও তার আমলের মাধ্যমে যখন এর ব্যতিক্রম কিছু পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও কাজে-কর্মের মাধ্যমে যখন কোন কিছুকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তখন সেটা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে।

‘শির্ক কি ও কেন?’ গ্রন্থের প্রণেতা ড. মুহাম্মদ মুয্‌যাম্মিল আলীর মতে ছোট শির্কের সংজ্ঞা হলোঃ “এমন সব কথা বা কাজ যদ্বারা বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সমান করে নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এই সমান করাটি প্রকৃতপক্ষে কর্তা ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়।”

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ছোট শির্ক অনেকটা মানুষের শির্কী উদ্দেশ্য বহির্ভূত কর্ম, যা প্রকারান্তে শির্ক সংঘটিত করে। তবে শির্কে আসগর কখনও কর্তা ব্যাক্তির মানসিক অবস্থা, উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাসের স্তরের উপর ভিত্তি করে শির্কে আকবরেও রূপান্তরিত হতে পারে। আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নির্ধারণ করা হয় এমন কোন কথা ও কাজ যখন কর্তা ব্যক্তির বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে করা না হয়, তখন সেটা শিরকে আসগর বা ছোট শির্ক হিসেবে বিবেচিত হবে; কিন্তু ঐ একই কর্মটির সাথে যখন কর্তা ব্যক্তির বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য এ দু'য়ের সমন্বয় সাধিত হয় তখন সেটা শির্কে আকবর বা বড় শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, তা'বীজের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে ছোট শিরকের অন্তর্গত কিন্তু তা প্রদানকারী ও ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বড় শির্কেও রূপান্তরিত হতে পারে। যদি কেউ মনে করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীতই তা'বীজ মানুষের উপর নিজ থেকেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তখন সেটা হবে বড় শির্ক। আর যদি সে মনে করে যে, আল্লাহ্‌ও ইচ্ছাতেই তা'বীজ কাজ করে থাকে তখন সেটা হবে ছোট শির্ক। এভাবে জ্যেতিষী বা গণকের কাছে আনাগোনা করা এবং এদের কথায় বিশ্বাস করা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু কখনও কখনও তা বড় শির্ক হিসেবেও গণ্য হতে পারে যখন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে এদের উপর নির্ভশীল থাকে এবং তাদেরকে নিজে থেকেই ইলমে গায়েবের হকদার বলে মনে করে। এ ছাড়াও অন্যন্য প্রকারর ছোট শির্কও কর্তার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বড় শির্কে রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রত্যেক এমন সব বিষয় যা বড় শিরকের মাধ্যম কিংবা শরী‘আতের দলীলে যে বিষয়গুলোকে শিরক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেগুলো বড় শিরকের গণ্ডিভুক্ত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শিরক দুই দিক থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে।

(১) এমন কিছু উপায়-উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দিক থেকে আল্লাহ তা‘আলা যে সব উপায়-উপকরণের অনুমতি দেননি। যেমন- হাতের কব্জি, পুতি বা এ ধরণের কিছু এ বিশ্বাস নিয়ে লটকানো যে, এগুলো সুরক্ষার উপকরণ কিংবা এগুলো

বদনজরকে প্রতিহত করে। অথচ আল্লাহ তা‘আলা এগুলোকে এসবের উপকরণ বানাননি; না শরী‘আতের বিধান হিসাবে; আর না তাকদীরের নিয়ম হিসেবে।

(২) কিছু কিছু জিনিসকে এমন সম্মান প্রদর্শন করার দিক থেকে; তবে এমন সম্মান যেটা ঐ জিনিসকে রুবূবিয়্যতের পর্যায়ে পৌঁছায় না। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যসত্তার নামে কসম করা কিংবা ‘যদি আল্লাহ ও অমুক না হত’ এভাবে বলা এবং এ ধরণের অন্যান্য কথা।

†QvU wki&‡Ki fqvenZv Ges wki&KKvixi cwiYwZ

ছোট শির্কের সংজ্ঞাঃ ছোট শির্ক হচ্ছে বড় শির্কের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। ছোট শির্ক সাধারণ কবিরা গুণাহের অন্তর্গত। শরিয়তের দৃষ্টিতে ছোট শির্ক এমন পর্যায়ের অপরাধ যে, কার্যত একজন মানুষ এ গুণাহে লিপ্ত থাকলে– সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। তার অপরাধ সাধারণ কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত তার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার এখতিয়ারে; এ অপরাধের জন্য আল্লাহ্ চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তার সংশিষ্ট নেক আমলটি বরবাদ হয়ে যায়।

আপাতঃদৃষ্টিতে ছোট শির্ককে লঘু অপরাধ বলে মনে হলেও এর বাস্তবতাকে খাটো করে দেখার কোন উপায় নেই। কেননা এটি একটি কবিরা গুণাহ এবং তা একজন মানুষের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা না করলে এর জন্য তাকে আখিরাতে কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। আবার যখন কোন ব্যক্তি অব্যাহত ভাবে ছোট শির্কে লিপ্ত থাকে তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এভাবে তার নেক আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যেতে পারে এবং তা তার জন্য বয়ে আনতে পারে প্রভুত অকল্যান এবং আখিরাতের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই ছোট শির্কের অপরাধকে লঘু মনে করে নির্বিকারে এবং অব্যহতভাবে এ গুণাহের সাথে লিপ্ত থাকার অবকাশ রয়েছে বলে ভাববার কোন সুযোগ নেই। পাপ করলেও শাস্তি ভোগ করতে হবেনা– এমনটি নিশ্চিত হয়ে পাপের কাজ চালিয়ে যাওয়া কোনো সুস্থ মানসিকতার পরিচয় নয়। বস্তুতঃ এ ভাবনায় বিভোর হয়ে যারা পাপের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা নিতান্তই ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে। পরকালীন কল্যাণের জন্য ছোট শির্ক সহ অন্যান্য সকল গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা তাই সকলেরই ব্রত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

ছোট শির্কের শাখা সমূহঃ

ছোট শির্কের অনেকগুলি শাখা রয়েছে। প্রধানতঃ ছোট শিরক্কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ অপ্রকাশ্য বা গোপণ শির্ক এবং প্রকাশ্য শির্ক।

অপ্রকাশ্য ছোট শির্ক: অপ্রকাশ্য শির্ক বলতে এমন সব বিষয়কে বুঝান হচ্ছে যা চোখে দেখা যায় না অথবা কানে শোনা যায় না এমনকি তা অনুভব করাও দুস্কর। কর্তা ব্যক্তির অগোচরেই সংঘটিত হয় এ শির্ক। এ শির্কের প্রধান শাখা হচ্ছে রিয়া। এ ছাড়াও শির্কে খফীও এ শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

রিয়া: ভাষাগতভাবে রিয়া এসেছে মূল শব্দ 'র'য়া' হতে- যার অর্থ দেখানো, অবলোকন করানো, দৃশ্যমান করা। পরিবর্তিত শব্দ যার অর্থ ভন্ডামি, কপটতা। শরিয়তের দৃষ্টিতে "রিয়া বলতে বুঝায় এমন কোন ইবাদত বা নেক আমল যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়ছে বলে মনে হয় অথচ তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে দেখানো বা অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়্যতে করা হয়।" সংজ্ঞাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, রিয়া সৃষ্টি হয় অন্তরে নিয়্যাতের মাধ্যমে। অন্ড়রের কাজটি হল ঈমানের ভিত্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা দেহের কাজ হল এর অনুসরণ এবং বাস্ড়বায়ন। অন্ড়রের ইবাদাত দৈহিক ইবাদতের চেয়ে মহৎ। অন্ড় রের নিয়্যত ছাড়া দেহের ইবাদত অর্থহীন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিয়্যত বা অন্ড়রের অকাঙ্খাই হচ্ছে যে কোন কাজের মৌলিক বিষয় ও দ্বীনের ভিত্তি আর তাই এটাই রিয়া সংঘটনের উপাদান। রিয়া মূলত দ্বীনের কোন কাজ অর্থাৎ ইবাদত ও সওয়াবের লক্ষ্যে সম্পাদিত নেক আমলের সাথে সম্পৃক্ত; কিন্তু মুয়ামালাত অর্থাৎ স্রেফ দুনিয়াবী কাজের সাথে এটা সম্পর্কিত নয়। বিভিন্ন প্রকারের ইবাদতের যে কোনটির চর্চা লোকদেখানো বা লোকের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং কোন প্রকার যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং আর্থিক সহ পার্থিব যে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে সম্পাদন করাই হচ্ছে রিয়া।

মানুষ স্বভাবতঃই সঙ্গী-সাথী বা অন্য লোকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে আশা করে এবং পেলে আনন্দিত হয়। কেউ যদি অপ্রত্যাশিতভাবে কারো প্রশংসা পেয়ে যায় সেটা কোন দোষের কিছু নয়। কিন্তু কোনো

ইবাদত ও নেক আমলের ক্ষেত্রে অন্য মানুষের প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করা দোষণীয়। কেননা ইবাদতের মূল শর্ত হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র সমীপে নিজেকে সমর্পন করা এবং কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার রাজী-খুশীর জন্য নিজেকে নিবেদন করা। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে দেখানো বা তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করার প্রচেষ্টা করা রিয়ার অপরাধ সংঘটিত করে থাকে।

মোটকথা, যাতে মানুষকে খুশী করা যায় এবং মানুষের প্রশংসা কুঁড়ান যায় এমন নিয়্যতে সম্পাদিত লোকপ্রদর্শণীমূলক সকল ইবাদত বা নেক আমলই রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কোনো নেক আমল লুক্কায়িতভাবে করার পর মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা কাউকে জানান বা বলে বেড়ানও এ শির্কের অন্তর্ভুক্ত। (শিরক ড. মোঃ সেলিম রেজা)

যেমন জেহাদ: মুসলিমদের জন্য জেহাদ একটি ফরয ইবাদত। জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে সমুন্নতরাখার উদ্দেশ্যে ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়ান। জেহাদ অত্যান্ত পূণ্যের কাজ যদি তা শুধু 'ফি সবিলিললাহ'-র নিয়তে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে খুশী করা বা দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে জেহাদ করা হলে তার কোনো বিণিময় আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে না। যদি শুধু সুনামের উদ্দেশ্যে অথবা সওয়াব ও সুনাম উভয় উদ্দেশ্যে জেহাদ করা হয় এমতবস্থায় কোনো পূণ্য আশা করা যায় না। এ বিষয়ের উপর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে বললেন, "ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি সওয়াব ও সুনামের জন্য জেহাদ করে, তার জন্য কি রয়েছে? " রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তার জন্য কিছুই নেই।" সে ব্যক্তি তা তিনবার পূণরাবৃত্তি করল। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবারই একই উত্তর দিলেন। তারপর তিনি বললেন, " আল্লাহর্ তা'আলা তাঁর জন্য কৃত খাঁটি আমল ব্যতীত– যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়, আর কিছুই কবুল করেন না।" হাদিস, সুনান নাসায়ী, নং ৩১৪২।

এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জেহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুকিপূর্ণ কাজেও আল্লাহর শরীক করা হলে অর্থাৎ রিয়া মিশ্রিত হলে তা প্রত্যখ্যাত হবে এবং আল্লাহর কাছে এর কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না। এখন দেখার বিষয় যে, জেহাদের মধ্যেও কিভাবে রিয়ার সংমিশ্রণ হতে পারে। নিয়ত এবং উদ্দেশ্যের কারণে জেহাদ রিয়ার আমলে পর্যবশিত হতে পারে বিভিন্নভাবে: মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্য থাকলে বীর বা বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হওয়ার সাধ থাকলে গনিমতের মাল হাসিলের উদ্দেশ্যে থাকলে এবং যে কোন প্রকার পার্থিব সুবিধা আদায়ের জন্য জেহাদ করা হলে। এ বিষয়গুলি পরিহার করে কেবলমাত্র আল্লাহর আদেশ পালনের স্বার্থে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে রিয়া মুক্ত জেহাদ পরিচালনা করা হলেই আল্লাহর কাছে তার বিণিময় আশা করা যায়।

কোরবানী: কোরবানীর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কাছে নিজেকে সমার্পন করা। যদিও বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে কোরবানী অনুষ্ঠিত হয় তবুও মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ আত্মিক।

আল্লাহ বলেছেন,

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ

" আল্লাহর নিকট পৌঁছেনা ওগুলির গোশ্‌ত এবং রক্ত বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া।" সুরা হাজ্জ, আয়াত-৩৭।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ কোরবানীর মূল উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে লোকপ্রদর্শনীর মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করার প্রচেষ্টা করে থাকে। কোরবানীর হাটে তাই প্রতিযোগিতা চলে, কে কত বড় এবং বেশী মূল্যের পশুটি ক্রয় করতে সক্ষম। এবং এই পশুটি কোরবানী করে লোকের প্রশংসা কুড়ায় এবং নিজেকে ধন্য মনে করে থাকে। আল্লাহর সমীপে নিজেকে নিবেদন করার অনুভূতিটুকুও সেখানে অনুপস্থিত। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের পরিবর্তে মানুষের প্রশংসা লাভের আকাঙ্খা মূখ্য হওয়াতে এটি রিয়ায় পরিণত হয়।

প্রকাশ্য ছোট শির্ক: প্রকাশ্য ছোট শির্ক বলতে ছোট শিরক সংঘটিত হয় এমন কথা ও কাজকে বোঝানো হয় যা সবাই চোখে দেখতে পায় অথবা কানে শুনতে পায় অথবা অনুভব করতে পারে। এ শির্কের অনেকগুলি প্রশাখা রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শির্কের আলোচনা এখানে উপাস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হল:

১। কসমের শিরকঃ কসমের শির্ক বলতে একমাত্র আল্লাহ্‌র তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিসত্তা বা বস্তুর নামে কসম খাওয়াকে বুঝান হয়। যেমনঃ বাপ-দাদা, পীর-অলী কিংবা চন্দ্র, সূর্য, মাটি ইত্যাদির নামে কসম করা।

তাই যদি কসম করতেই হয় তাহলে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নামেই কসম করার বৈধতা রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো সত্তা, ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর নামে কসম খাওয়া প্রকাশ্য ছোট শির্ক। এ বিষয়টি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সাঈদ ইবনে আবী ওবায়দা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন, "একবার ইবনে উমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে কাবার নামে শপথ করতে শুনে তাকে বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা অবৈধ। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে কসম খেল সে শির্ক করল।" হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৪৭৭ অন্য একটি হাদিসে গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার নিষিদ্ধতা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার নামে শপথ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে উমর (রাঃ) থেকে। কিনি বলেন যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামে শপথ করতে বারণ করেছেন। শপথকারী হয় আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবে অথবা চুপ থাকবে।" হাদিস, তিরমিযী শরীফ, নং ১৪৭৬ গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার অবৈধতার উপর আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেন, "তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে, তোমাদের মায়ের নামে এবং মূর্তির নামে কসম করবে না। আর তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ খাবে না।" হাদিস, আবু দাউদ শরীফ, নং ৩২৩৪ উপর্যুপরি হাদিসদৃষ্টে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে গায়রুল্লাহর নামে কসম করা অবৈধ এবং শির্ক। তাই কোন নবী, রাসূল, ফিরিশতা, জ্বিন, পীর, বুজুর্গ, অলি, পিতা-মাতা বা ছেলে-সন্তান ইত্যাদি এবং অন্যকোন ব্যক্তি বা সৃষ্ট বস্তুর কসম খাওয়া না জায়েয এবং ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

২। যাদু-টোনার শিরকঃ যাদুর শির্ক বলতে এমন কতগুলো মন্ত্র-তন্ত্র বা অবোধগম্য শব্দসমষ্টিকে বুঝান হয় যা যাদুকর নিজে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে আবার কখনো কখনো বিভিন্ন ওষুধ, সুতায় গিরা বা ধুনা দিয়েও যাদু করা হয়। যাদু-টোনা এমন সব অদ্ভুত কর্মকাণ্ড যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বনে জ্বিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধন করা হয়। যাদুর বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বোধ্য কৌশলগত ব্যাপার এবং এর সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করাও কষ্টসাধ্য। তবে সাধারণ পরিভাষায় যাদু বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যাতে জ্বিন ও শয়তানের কারসাজি, কুফরী বাক্যের প্রভাব, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর অদৃশ্য প্রভাব, মেসম্যারিজমে কল্পনাশক্তির প্রভাব প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান থাকতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিক্রিয়া এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতিক্রিয়া, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া– যেমন জ্বীন-পরী, দানব বা শয়তানের প্রতিক্রিয়া অথবা সম্মোহনী শক্তির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। যাদু সত্য এবং যাদুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধিত করার বাস্তবতাও অনস্বীকার্য। তবে যাদু কোন জিনিসের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না' বরং নকল ও কৃত্রিম ধারণার জন্ম দেয় মাত্র।

এগুলো করতে গেলে জ্বিন ও শয়তানের নামে মানত ও বলি দিতে হয় কিংবা যে কোন উপায়ে তাদের নৈকট্য লাভ করতে হয়–যা কুফর এবং শিরকের অন্তর্গত। যাদুকরেরা ইলমুল গায়েবের দাবী করে থাকে। এটাও একটি মারাত্মক শির্ক। যাদু-টোনা একটি কুফরী কাজ। যাদু চর্চাকারী অর্থাৎ যে যাদুকর তার মন্ত্রবলে কোন জ্বিন বা শয়তানকে বশীভূত করে যাদুর কাজে ব্যবহার করে সে কাফির এবং এ যাদুর সহযোগীতা গ্রহণকারীরাও তাদের দলভুক্ত। বিষয়টি পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ
يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ
حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ
وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ
لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ
١٠٢

Òআর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত যাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিলো। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা ; কাজেই তুমি কুফরী করো না।' তা সত্বেও তারা ফিরিশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন যাদু শিখতো যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যাতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। আর তারা তা-ই শিখতো যা তাদের ক্ষতি করতো এবং কোনো উপকারে আসত না আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ যাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো ! Ó Avj †KviAvb, myiv evKviv, AvqvZ -102|

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ঘটনা এবং যাদুর মূল তত্ত্বের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট একটি আংটি ছিল। পায়খানায় গেলে তিনি ওটা তার স্ত্রী জারাদার নিকট রেখে যেতেন। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর পরীক্ষার সময় এলে একটি শয়তান জ্বীন তার রূপ ধরে তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং আংটি চায়। তা তাকে দিয়ে দেয়া হয়। সে তা

পরে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনে বসে যায়। সমস্ত জ্বীন, মানব ও শয়তান তার খিদমতে হাজির হয়। সে শাসন কার্য চালাতে থাকে। এদিকে হযরত সুলাইমান (আঃ) ফিরে এসে তার স্ত্রীর নিকট আংটি চান। তাঁর স্ত্রী বলেনঃ তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি সুলাইমান (আঃ) নও। সুলাইমান (আঃ) তো আংটিটি নিয়েই গেছেন।'

হযরত সুলাইমান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর পরীক্ষা। এ সময়ে শয়তানরা যাদু বিদ্যা, জ্যোতিষ বিদ্যা এবং ভবিষ্যতের সত্য-মিথ্যা খবরের কতকগুলো কিতাব লিখে এবং ওগুলো হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে। হযরত সুলাইমান (আঃ) এর পরীক্ষার যুগ শেষ হলে পুনরায় তিনি সিংহাসন ও রাজপাটের মালিক হয়ে যান। স্বাভাবিক বয়সে পৌছে যখন তিনি রাজত্ব হতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন শয়তানরা জনগণকে বলতে শুরু করে যে, হযরত সুলাইমানের (আঃ) ধনাগার এবং ঐ পুস্তক যার বলে তিনি বাতাস ও জ্বীনদের উপর শাসনকার্য চালাতেন তা তাঁর সিংহাসনের নীচে পোঁতা রয়েছে। জ্বীনেরা ঐ সিংহাসনের নিকটে যেতে পারতো না বলে মানুষেরা ওটা খুঁড়ে ঐ সব পুস্তক বের করে। সুতরাং বাইরে এর আলোচনা হতে থাকে এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বের রহস্য এটাই ছিল। এমনকি জনগণ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নবুওয়াতকেও অস্বীকার করে বসে এবং তাঁকে যাদুকর বলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা অস্বীকার করেন এবং আল্লাহর ফরমান জারী হয় যে, যাদু বিদ্যার এ কুফরী শয়তানরা ছড়িয়ে ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) ওটা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট একটি লোক আগমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "কোথা হতে আসছো?' সে বলেঃ ইরাক ইতে। তিনি বলেনঃ ইরাকের কোন শহর হতে?' সে বলেঃ কুফা হতে। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "তথাকার সংবাদ কি?' সে বলেঃ তথায় আলোচনা হচ্ছে যে, হযরত আলী (রাঃ) মারা যাননি; বরং তিনি জীবিত আছেন এবং সত্বরই আসবেন। একথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কেঁপে উঠেন এবং বলেনঃ 'এটা সত্য হলে আমরা তাঁর মীরাস বন্টন করতাম না। আর তাঁর স্ত্রীগণকে বিয়ে করতাম। শুন! শয়তানরা আকাশবানী চুরি করে শুনে নিতে এবং তাদের নিজস্ব কথা মিলিয়ে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতো।

হযরত সুলাইমান (আঃ) ঐ সব পুস্তক জমা করে তার সিংহাসনের নীচে পুঁতে দেন। তার মৃত্যুর পর জ্বীনেরা পুনরায় তা বের করে নেয়। ঐ পুস্তকগুলো ইরাকের মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে এবং ঐ পুস্তকগুলোর কথাই তারা বর্ণনা করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে।

সেই যুগে এটাও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, শয়তানরা ভবিষ্যত জানে। হযরত সুলাইমান (আঃ) এই পুস্তকগুলো বাক্সে ভরে পুঁতে ফেলার পর এই নির্দেশ জারী করেন যে, যে একথা বলবে তার মাথা কেটে নেয়া হবে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর জীনেরা ঐ পুস্তকগুলো তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে এবং ওর প্রথম পষ্ঠায় লিখে রাখেঃ "এই জ্ঞানভাণ্ডার 'আসিফ বিন রখিয়া কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়েছে, যিনি হযরত সুলাইমান বিন দাউদের (আঃ) প্রধানমন্ত্রী, বিশিষ্ট পরামর্শ দাতা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।" ইয়াহূদীদের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) নবী ছিলেন না, বরং যাদুকর ছিলেন। এই কারণেই উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর সত্য নবী (সঃ) অন্য এক সত্য নবীকে (আঃ) কালিমামুক্ত করেন এবং ইয়াহুদীদের বদ-আকীদার অসারতা ঘোষণা করেন। তারা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নাম নবীদের নামের তালিকাভুক্ত শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠতো। এজন্যেই এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও একটা কারণ যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) কষ্টদায়ক প্রাণী হতে কষ্ট না দেয়ার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তাদেরকে ঐ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই তারা কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকতো। অতঃপর জনগণ নিজেরাই কথা বানিয়ে নিয়ে যাদু মন্ত্র ইত্যাদির সম্বন্ধ হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। ওর অসারতা এই পবিত্র আয়াতে রয়েছে। এখানে عَلٰى শব্দটি فِىْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিংবা تَتْلُوْا শব্দটি تَكْذِبُ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই উত্তম। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি আছে যে, যাদু হযরত সুলাইমান (আঃ) এর পূর্বেও ছিল। এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা। হযরত সুলাইমান (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর পর যুগের নবী। আর হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে যাদুকরদের বিদ্যমানতা কুরআন মাজীদ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে এবং হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর আগমন হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে হওয়াও কুরআন কারীম দ্বারাই প্রকাশ পেয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ) ও জালুতের ঘটনায় আছেঃ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর পরে। এমনকি

হযরত ইবরাহীম (আঃ) إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ-এরও পূর্বে হযরত সালিহ (আঃ)কে তার কওম' বলেছিলঃঅর্থাৎ তুমি যাদুকৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (২৬:১৮৫)

অতঃপর আল্লাহ বলেন وَمَاأُنْزِلَ কেউ কেউ বলেন যে, এখানে مَا শব্দটি না বাচক এবং ওর সংযোগ রয়েছে। مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ-এর উপর।

ইয়াহুদীদের আর একটি বদ-আকীদা ছিল এই যে, ফেরেশতাদের উপর যাদু অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতে তাকেই খণ্ডন করা হয়েছে। مَارُوْت ও هَارُوْت শব্দ দুটি شَيَاطِيْن হতে بَدَلْ হয়েছে। দ্বিবচনের উপরও বহু বচনের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন- اِنْ كُنَّ لَهٗ اِخْوَةٌ-এর মধ্যে রয়েছে। কিংবা তাদের অনুসারীদেরকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদের দুজনের নাম খুবই অবাধ্যতার কারণে প্রকাশ করা হয়েছে।

কুরতুবী (রঃ) তো বলেন এটাই সঠিক ভাব। এছাড়া অন্য ভাব নেয়ার প্রয়োজন নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাদু আল্লাহু, নাযিল করেননি। রাবী' বিন আনাস (রঃ) বলেন যে, তাদের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ হয়নি। এর উপর ভিত্তি করে আয়াতের তরজমা হবে এইঃ 'ঐ ইয়াহুদীরা ঐ জিনিসের অনুসরণ করেছে যা শয়তানরা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর যুগে পড়তো। হযরত সুলাইমান (আঃ) কুফরী করেনি, না আল্লাহ তা'আলা ঐ দু' ফেরেশতার উপর যাদু অবতীর্ণ করেছেন; (যেমন-হে ইয়াহুদী! জিবরাঈল (আঃ) ও মীকাঈলের (আঃ) প্রতি তোমাদের ধারণা রয়েছে) বরং এ কুফরী ছিল শয়তানদের, যারা বাবেলে জনগণকে যাদু শিখাতো এবং তাদের সরদার ছিল মানুষ, যাদের নাম ছিল হারূত ও মারূত। হযরত আবদুর রহমান বিন আবৃজা (রঃ) নিম্নরূপ পড়তেনঃ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ অর্থাৎ দাউদ ও সুলাইমান এই দু'বাদশাহর উপরেও যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি? ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) একে শক্তভাবে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন যে, مَا শব্দটি اَلَّذِیْ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আর হারুত ও মারূত দুজন ফেরেশতা। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন এবং বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিতে ঐ দু'ফেরেশতাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই তারা আল্লাহর সে আদেশ পালন করেছিলেন।

একটি দুর্বল মত এও আছে যে, এটা জ্বীনদের দু'টি গোত্র। مَلَكَيْنِ দু'বাদশাহর কিরআতে أَنْزِلَ-এর অর্থ হবে সৃষ্টি করা। যেমন, আল্লাহ পাক বলেছেনঃ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ

مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকারের চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন।' (৩৯:৬) আরও বলেছেনঃ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ অর্থাৎ আমি লোহা সৃষ্টি করেছি।' (৫৭:২৫) হাদীসের মধ্যেও اِنْزَالْ শব্দটি সৃষ্টি করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ مَااَنْزَلَ اللهُ دَاءً الخ অর্থাৎ 'আল্লাহ যতগুলো রোগ সৃষ্টি করেছেন, ওগুলোর ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। উপরোক্ত সব স্থানেই اِنْزَالْ শব্দটি সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; আনা বা অবতীর্ণ করা অর্থে নয়। দ্রুপ এ আয়াতেও।

পূর্ব যুগীয় অধিকাংশ মনীষীদের মাযহাব এই যে, এই দু'জন ফেরেশতা ছিলেন। একটি মারফু হাদীসেও এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণিত হচ্ছে। কেউ যেন এ প্রশ্ন উত্থাপন না করেন যে, ফেরেশতাগণ তো নিস্পাপ। তাদের দ্বারা তো পাপকার্য হতেই পারে না। অথচ জনগণকে যাদু শিক্ষা দেয়া, এতো কুফরী? এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে না। কেননা, এ দু'জন ফেরেশতা সাধারণ ফেরেশতাগণ হতে পৃথক হয়ে যাবে, যেমন ইবলিস পৃথক হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত কাবুল আহবার (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ) এবং হযরত কালবী (রঃ) এটাই বলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বলতে শুনেছেনঃ যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, অতঃপর তারা আল্লাহর নাফরমানী করতে থাকে, তখন ফেরেশতগণ পরস্পর বলাবলি করেন- "দেখ এরা কত দুষ্ট প্রকৃতির লোকে এবং এরা কতই না অবাধ্য! আমরা এদের স্থলে থাকলে কখনও আল্লাহর অবাধ্য হতাম না-তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে নিয়ে এসো; আমি তাদের মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতঃ তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিচ্ছি; তার পরে দেখা যাক তারা কি করে। তারা তখন হারূত ও মারূতকে হাজির করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতঃ তাদেরকে বলেনঃ "দেখ, বানী আদমের নিকট তো আমি নবীদের মাধ্যমে আমার আহকাম পৌছিয়ে থাকি; কিন্তু তোমাদেরকে মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আমি বলে দিচ্ছি। আমার সাথে কাউকেও অংশীদার করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং মদ্যপানও করবে না।

তখন তারা দুজন পৃথিবীতে অবতরণ করে। তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তাআলা যুহরাকে একটি সুন্দরী নারীর আকারে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। তারা তাকে দেখেই বিমোহিত হয়ে পড়ে এবং তার সাথে ব্যভিচার করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে বলেঃ তোমারা শিরক করলে আমি সম্মত আছি।' তারা উত্তর দেয়ঃ ‘এটা আমাদের দ্বারা হবে না। সে চলে যায়। আবার সে এসে বলেঃ তোমরা যদি এই শিশুটিকে হত্যা কর তবে আমি তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হবো। তারা ওটাও প্রত্যাখ্যান করে। সে আবার আসে এবং বলেঃ আচ্ছা, এই মদ পান করে নাও। তারা ওটাকে ছোট পাপ মনে করে তাতে সম্মত হয়ে যায়। এখন তারা নেশায় উন্মত্ত হয়ে ব্যভিচারও করে বসে এবং শিশুটিকে হত্যা করে ফেলে।

তাদের চৈতন্য ফিরে আসলে ঐ স্ত্রীলোকে তাদেরকে বলেঃ যে যে কাজ - করতে তোমরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলে তা সবই করে ফেলেছে। তারা তখন লজ্জিত হয়ে যায়। তাদেরকে দুনিয়ার শাস্তি বা আখেরাতের শাস্তির যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়। তারা দুনিয়ার শাস্তি পছন্দ করে। সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদ-ই-আহমাদ, তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এবং তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের এ বর্ণনাটি গরীব। ওর মধ্যে একজন বর্ণনাকারী মূসা বিন যুবাইর আনসারী রয়েছে-ইবনে আবি হাতিমের (রঃ) মতে সে নির্ভরযোগ্য নয়। তাফসীর-ই- ইবনে মিরদুওয়াই এর মধ্যে একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, একদা রাত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হযরত নাফে' (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করেনঃ যুহরা তারকাটি বের হয়েছে কি?' তিনি বলেনঃ ‘না’। দুতিন বার প্রশ্নের পর বলেনঃ এখন উদিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) তখন বলেন ' ও যেন খুশিও না হয় এবং ওর আনন্দ লাভও যেন না হয়। হযরত নাফে (রাঃ) তখন তাকে বলেনঃ

জনাব, একটি তারকা যা আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে উদিত ও অস্তমিত হয় তাকে আপনি মন্দ বলেন?' তিনি তখন বলেনঃ তবে শুনুন জনাব আমি ঐ কথাই বলছি যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট হতে শুনেছি। অতঃপর উল্লিখিত হাদীসটি শব্দের বিভিন্নতার সাথে বর্ণনা করেন। কিন্তু এটাও গরীব বা দুর্বল। হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি মারফু হওয়া অপেক্ষা মাওকুফ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সম্ভবতঃ এটা ইসরাঈলী বর্ণনাই হবে। আল্লাহ তাআলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। সাহাবা (রাঃ) এবং তাবেঈন (রাঃ) হতেও এ ধরনের বহু বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, যুহরা একটি স্ত্রী লোক ছিল। সে ফেরেশতাদের সাথে শর্ত করে বলেছিলঃ ' তোমরা আমাকে ঐ দোআটি শিখিয়ে দাও যা পড়ে তোমরা আকাশে উঠে থাকো। তারা তাকে তা শিখিয়ে দেয়। সে এটা পড়ে আকাশে উঠে যায় এবং তথায় তাকে তারকায় রূপান্তরিত করা হয়। কতকগুলো মারফু বর্ণনায়ও এটা আছে; কিন্তু ওটা মুকার ও বে-ঠিক। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, এ ঘটনার পূর্বে তো ফেরেশতাগণ শুধুমাত্র মুমিনদের জন্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, কিন্তু এর পর তারা সারা দুনিয়াবাসীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন।
কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, যখন এই ফেরেশতাদ্বয় হতে এ অবাধ্যতা প্রকাশ পায় তখন অন্যান্য ফেরেশতাগণ স্বীকার করেন যে, বানী আদম আল্লাহ পাক হতে দূরে রয়েছে এবং তাকে না দেখেই ঈমান এনেছে, সুতরাং তাদের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঐ ফেরেশতাদ্বয়কে বলা হয়ঃ তোমরা দুনিয়ার শাস্তি গ্রহণ করে নাও, অথবা পরকালের শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।' তারা দুজন পরামর্শ করে দুনিয়ার শাস্তিই গ্রহণ করে। কেননা, এটা অস্থায়ী এবং পরকালের শাস্তি চিরস্থায়ী। সুতরাং বাবেলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।
একটি বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে নির্দেশাবলী দিয়েছিলেন তাতে হত্যা ও অবৈধ মালের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং এ হুকুমও ছিল যে,তারা যেন ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করে। এও এসেছে যে, তারা তিনজন ফেরেশতা ছিল। কিন্তু একজন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিরে যায়। অতঃপর দু'জনের পরীক্ষা নেয়া হয়।
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর যুগের ঘটনা। এখানে বাবেল দ্বারা দুনিয়ায় অন্দের বাবেলকে বুঝান হয়েছে। স্ত্রীলোকটির নাম আরবী ভাষায় ছিল যুহরা' বানতী ভাষায় ছিল ‘বেদখত্ এবং ফারসী ভাষায় ছিল ‘আনাহীদ'। এ স্ত্রীলোকেটি তার স্বামীর বিরুদ্ধে একটি মোকাদ্দমা এনেছিল। যখন তারা তার সাথে অসৎ কাজের ইচ্ছে করে তখন সে বলে-যদি আগে আমাকে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে ফায়সালা দাও তবে আমি সম্মত আছি। তারা তাই করে। পুনরায় সে বলেঃ ‘তোমরা যা পড়ে আকাশে উঠে থাকো ও পড়ে নীচে নেমে আস ওটাও আমাকে শিখিয়ে দাও। তারা ওটাও তাকে শিখিয়ে দেয়। সে ওটা পাঠ করে আকাশে উঠে যায়। কিন্তু নীচে নেমে আসার দু'আ ভুলে যায়। সেখানেই তার দেহকে তারকায় রূপান্তরিত করা।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) কখনও যুহরা তারকা দেখলে তাকে অভিশাপ দিতেন। যখন এই ফেরেশতারা আকাশে উঠতে চাইলো কিন্তু উঠতে পারলো না। তখন তারা বুঝে নিলো যে, এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য।
হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, প্রথম কিছুদিন তো এই ফেরেশতারা স্থিরই। ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করতো এবং সন্ধ্যার পর। আকাশে উঠে যেতো। অতঃপর যুহরাকে দেখে নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। যুহরা তারকাকে একটি সুন্দরী স্ত্রীর আকৃতিতে তাদের নিকট। পাঠিয়ে দেয়া হয়। মোট কথা, হারুত ও মারূতের এ ঘটনা তাবেঈগণের মধ্যেও বহু লোক বর্ণনা করেছেন। যেমন, মুজাহিদ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), মুকাতিল বিন হিব্বান (রঃ) প্রভৃতি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুফাসসিরগণও নিজ নিজ তাফসীরে এটা এনেছেন। কিন্তু এর অধিকাংশই বানী ইসরাঈলের কিতাবসমূহের উপর নির্ভরশীল। এ অধ্যায়ে কোন সহীহ মারফু মুত্তাসিল হাদীস রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে সাব্যস্ত নেই। আবার কুরআন হাদীসের মধ্যেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই। সুতরাং আমাদের ঈমান ওর উপরেই রয়েছে যে, যেটুকু কুরআন মাজীদে আছে ওটাই সঠিক। আর প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে একটি দুর্বল হাদীস রয়েছে, যাতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরলোক গমনের অল্প দিন পরে দাওমাতুল জানাল’ হতে একটি স্ত্রীলোক তার খোঁজে আগমন করে। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়েই সে উদ্বিগ্ন হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি- ব্যাপার কি? সে বলেঃ আমার মধ্যে ও আমার স্বামীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রায় লেগেই থাকতো। একবার সে আমাকে ছেড়ে কোন্ অজানা জায়গায় চলে যায়। একটি বৃদ্ধার নিকট আমি এসব কিছু বর্ণনা করি। সে আমাকে বলে- “তোমাকে যা বলি তাই কর, সে আপনা আপনি চলে আসবে। আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম। রাত্রে সে দুটি কুকুর নিয়ে আমার নিকট আগমন করে। একটির উপর সে আরোহণ করে এবং অপরটির উপর আমি আরোহণ করি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা দু'জন বাবেলে চলে যাই। তথায় গিয়ে দেখি যে, দু’টি লোক শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় লটকানো রয়েছে। ঐ বৃদ্ধা আমাকে বলে-তাদের নিকট যাও ও বল-“আমি যাদু শিখতে এসেছি। আমি তাদেরকে একথা বলি। তারা বলে-‘জেনে রেখো, আমরা তো পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি। তুমি যাদু শিক্ষা করো যাদু শিক্ষা করা কুফরী।' আমি বলি-শিখবো।

তারা বলে-“আচ্ছা, তাহলে যাও, ঐ চুল্লীর মধ্যে প্রস্রাব করে চলে এসো। আমি গিয়ে প্রস্রাবের ইচ্ছে করি, কিন্তু আমার অন্তরে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হয়, সুতরাং আমি ফিরে এসে বলিআমি কাজ সেরে এসেছি। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে -“তুমি কি দেখলে আমি বলি-“কিছুই না। তারা বলে-“তুমি ভুল বলছে। এখন পর্যন্ত তুমি বিপথে চালিত হওনি। তোমার ঈমান ঠিক আছে, তুমি এখনও ফিরে যাও এবং কুফরী করো না। আমি বলি-“আমাকে যে যাদু শিখতেই হৰে। তারা পুনরায় আমাকে বলে-ঐ চুল্লীতে প্রস্রাব করে এসো। আমি আবার যাই। কিন্তু এবারও। মন চায় না, সুতরাং ফিরে আসি। আবার এভাবেই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। পুনরায় আমি চুল্লীর নিকট যাই এবং মনকে শক্ত করে প্রস্রাব করতে বসে পড়ি। আমি দেখি যে, একজন ঘোড়া সওয়ার মুখের উপর পর্দা ফেলে আকাশের উপর উঠে গেল। আমি ফিরে এসে তাদের নিকট এটা বর্ণনা করি। তারা বলে- 'হাঁ, এবার তুমি সত্য বলছে। ওটা তোমার ঈমান ছিল, যা তোমার মধ্য হতে বেরিয়ে গেল। এখন চলে যাও।

আমি এসে ঐ বৃদ্ধাকে বলি- ‘তারা আমাকে কিছুই শিক্ষা দেয়নি। সে বলে- যথেষ্ট হয়েছে। তোমার নিকট সবই চলে এসেছে। এখন তুমি যা বলবে তাই হবে। আমি পরীক্ষামূলকভাবে একটি গমের দানা নিয়ে মাটিতে ফেলে দেই। অতঃপর বলি- গাছ হও।' ওটা গাছ হয়ে গেল। আমি বলি-- তোমাতে ডাল পাতা গজিয়ে যাক।' তাই হয়ে গেল। তার পর বলি- ‘শুকিয়ে যাও।' ডালপাতা শুকিয়ে গেল। অতঃপর বলি-‘পৃথক পৃথকভাবে দানা দানা হয়ে যাও। ওটা তাই হয়ে গেল। তারপরে আমি বলি-শুকিয়ে যাও। ওটা শুকিয়ে গেল। অতঃপর বলি-আটা হয়ে যাও।' আটা হয়ে গেল। আমি বলি-রুটি হয়ে যাও।' রুটি হয়ে গেল। এটা দেখেই আমি লজ্জিত হয়ে যাই এবং বে-ঈমান হয়ে যাওয়ার কারণে আমার খুবই দুঃখ হয়। হে উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহর শপথ! আমি যাদুর দ্বারা কোন কামও নেইনি এবং কারও উপর এটা প্রয়োগও করিনি। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁকে পেলাম না। এখন আমি কি করি?

একথা বলেই সে পুনরায় কাঁদতে আরম্ভ করে এবং এত কাঁদে যে, সবারই মনে তার প্রতি দয়ার সঞ্চার হয়। তাকে কি ফতওয়া দেয়া যেতে পারে এ ব্যাপারে সাহাবীগণও (রাঃ) খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন।

অবশেষে তারা বলেন- এখন এ ছাড়া আর কি হবে যে, তুমি এ কাজ করবে না, তাওবা করবে এবং মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আর পিতা-মাতার খিদমত করবে। এই ইসনাদ সম্পূর্ণ সঠিক।

কেউ কেউ বলেন যে, যাদুর বলে প্রকৃত জিনিসই পরিবর্তিত হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, না, দর্শকের শুধু এর ধারণা হয়ে থাকে মাত্র, প্রকৃত জিনিস যা ছিল তাই থাকে। যেমন কুরআন পাকে রয়েছেঃ অর্থাৎ তারা মানুষের চোখে যাদু করে দিয়েছে।' سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ (৭:১১৬) অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন অর্থাৎ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى হযরত মূসার (আঃ) মনে এ ধারণা দেয়া হয়েছে যে, যেন ঐ সাপগুলো তাদের যাদুর বলে চলাফেরা করছে।' (২০:৬৬) এ ঘটনা দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এ আয়াতে বাবেল' শব্দ দ্বারা ইরাকের বাবেলকে বুঝানা হয়েছে, দুনিয়া অন্দের' বাবেল নয়। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী ইবনে আবূ তাবিল (রাঃ) বাবেলের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আসরের নামাযের সময় হলে তিনি তথায় নামায আদায় করলেন না, বরং বাবেলের সীমান্ত পার হয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর বললেনঃ ‘আমার প্রিয় রাসূল (সঃ) আমাকে গোরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং বাবেলের ভূমিতেও নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এটা অভিশপ্ত ভূমি। সুনান-ই-আবি দাউদের মধ্যেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এ হাদীসের উপর কোন সমালোচনা করেননি।

আর যে হাদীসকে ইমাম আবু দাউদ (রঃ) স্বীয় কিতাবে নিয়ে আসেন এবং ওর সনদের উপর নীরবতা অবলম্বন করেন ঐ হাদীস ইমাম সাহেবের মতে হাসান হয়ে থাকে। এর দ্বারা জানা গেল যে, বাবেলের ভূমিতে মামায পড়া মাকরূহ। যেমন সামুদ সম্প্রদায়ের ভূমি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তাদের বাস ভূমিতেও যেয়ো না। যদি ঘটনাক্রমে যেতেই হয়, তবে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাও।

আল্লাহ তা'আলা হারুত ও মারূতের মধ্যে ভাল-মন্দ, কুফর ও ঈমানের জ্ঞান দিয়ে রেখেছিলেন বলে তারা কুফরীর দিকে গমনকারীদের উপদেশ দিতো। এবং তাদেরকে ওটা হতে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। কিন্তু যখন কোনক্রমেই মানতো না তখন তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিখিয়ে দিতো। ফলে তাদের ঈমানের আলো বিদায় নিতে এবং যাদু চলে আসতো। শয়তান তাদের বন্ধু হয়ে যেতো। ঈমান বিদায় নেয়ার পর আল্লাহর অভিশাপ তাদের উপর নেমে আসতো। ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেন যে, কাফির ছাড়া আর কেউ যাদু বিদ্যা শিখবার সৎ সাহস রাখতে পারে না। فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ এখানে বিপদ, আজমায়েশ ও পরীক্ষা। এ আয়াতের মাধ্যমে এটাও জানা গেল যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা কুফরী।

হাদীসের মধ্যেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন যাদুকরের নিকট গমন করে এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর নাযিলকৃত ওয়াহীর সাথে কুফরী করে। (বার)'। এ হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং-এর সমর্থনে অন্যান্য হাদীসও এসেছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মানুষ হারুত ও মারূতের কাছে গিয়ে যাদু বিদ্যা শিক্ষা করতো। ফলে তারা খারাপ কাজ করতো এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যেতো। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ শয়তান তার সিংহাসনটি পানির উপর রাখে। অতঃপর মানুষকে বিপথে চালানোর জন্যে সে তার সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দেয়। সেই তার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত

যে হাঙ্গামা সৃষ্টির কাজে সবচেয়ে বেড়ে যায়। এরা ফিরে এসে নিজেদের জঘন্যতম কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়। কেউ বলেঃ আমি অমুককে এভাবে পথ ভ্রষ্ট করেছি। কেউ বলেঃ আমি অমুক ব্যক্তিকে এ পাপ কার্য করিয়েছি। শয়তান তাদেরকে বলেঃ ‘বো কিছুই করনি। এতো সাধারণ কাজ। অবশেষে একজন এসে বলেঃ আমি একটি নোক ও তার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছি, এমনকি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। শয়তান তখন তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলেঃ হ, তুমি বড় কাজ করেছে। সে তাকে পার্শ্বে বসিয়ে নেয় এবং তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়।'

যাদুকরও তার যাদুর দ্বারা ঐ কাজই করে থাকে, যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। যেমন তার কাছে স্ত্রীর আকৃতি খারাপ মনে হবে কিংবা তার স্বভাব চরিত্রকে সে ঘৃণা করবে অথবা অন্তরে শত্রুতার ভাব জেগে যাবে ইত্যাদি। আস্তে আস্তে এসব বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদই ঘটে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যাদু দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। অর্থাৎ ক্ষতি সাধন করা তাদের ক্ষমতার মধ্যেই নেই। আল্লাহর ভাগ্য লিখন অনুযায়ী তার ক্ষতিও হতে পারে, আবার তার ইচ্ছে হলে যাদু নিষ্ক্রিয়ও হতে পারে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যাদু শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিরই ক্ষতি করে থাকে, যে ওটা লাভ করে ওর মধ্যে প্রবেশ করে।

এরপর আল্লাহ পাক বলেন যে, তারা এমন জিনিস শিক্ষা করে যা তাদের জন্যে শুধু ক্ষতিকারক, যার মধ্যে উপকার মোটেই নেই। ঐ ইয়াহুদীরা জানে যে,যারা আল্লাহর রাসূলের (সঃ) আনুগত্য ছেড়ে যাদুর পিছনে লেগে থাকে তাদের জন্যে আখেরাতের কোনই অংশ নেই। তাদের না আছে আল্লাহর কাছে কোন সম্মান, না তাদেরকে

ধর্মভীরু মনে করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যদি তাদের এ মন্দ কাজের অনুভূতি হতো এবং ঈমান এনে খোদাভীরুতা অবলম্বন করতো তবে ওটা নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে মঙ্গলজনক ছিল। কিন্তু এরা অজ্ঞান ও নির্বোধ।
অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "জ্ঞানীগণ বলে- তোমাদের জন্যে আফসোস! আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণ ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে বড়ই উত্তম, কিন্তু ওটা একমাত্র ধর্মশীলগণই পেয়ে থাকে।

হযরত ইমাম আহমাদ (রঃ) ও পূর্ব যুগীয় মনীষীদের একটি দল যাদু বিদ্যা শিক্ষার্থীকে কাফির বলেছেন। কেউ কেউ কাফির তো বলেন না, কিন্তু বলেন যে, যাদুকরকে হত্যা করাই হচ্ছে তার উপযুক্ত শাস্তি। হযরত বাজালাহ বিন উবাইদ (রঃ) বলেনঃ হযরত উমার (রাঃ) তাঁর এক নির্দেশ নামায় লিখেছিলেনঃ যাদুকর পুরুষ বা স্ত্রীকে তোমরা হত্যা করে দাও।' এ নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তিনজন যাদুকরের গর্দান উড়িয়েছি।'

সহীহ বুখারী শরীফে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রাঃ) উপর তার দাসী যাদু করেছিল বলে তাকে হত্যা করা হয়। হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) বলেন যে, তিনজন সাহাবী (রাঃ) হতে যাদুকরকে হত্যা করার ফতওয়া রয়েছে। জামে' উত তিরমিযীর মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তরবারি দ্বারা হত্যা করা।' এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইসমাঈল বিন মুসলিম দুর্বল। সঠিক কথা এটাই মনে হচ্ছে যে, এ হাদীসটি মাওকুফ। কিন্তু তাবরানীর হাদীসের মধ্যে অন্য সনদেও এ হাদীসটি মার' রূপে বর্ণিত আছে। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন। '

ওয়ালীদ বিন উকবার নিকট একজন যাদুকর ছিল, সে তার যাদু কার্য বাদশাহকে দেখাতো। সে প্রকাশ্যভাবে একটি লোকের মাথা কেটে নিতো। অতঃপর একটা শব্দ করতো, আর তখনই মাথা জোড়া লেগে যেতো মুহাজির সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে একজন মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী (রাঃ) ওটা দেখেন এবং পরের দিন তরবারি নিয়ে আসেন। যাদুকর খেলা আরম্ভ করার সাথে সাথেই তিনি স্বয়ং যাদুকরেরই মাথা কেটে ফেলেন এবং বলেনঃ "তুমি সত্যবাদী হলে নিজেই জীবিত হয়ে যাও।' অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ "তোমরা যাদুর নিকট যাচ্ছ ও তা দেখছো?' ঐ সাহাবী (রাঃ) ওয়ালীদের নিকট হতে তাকে হত্যা করার অনুমতি নেননি বলে বাদশাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং শেষে তাকে ছেড়ে দেন।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) হযরত উমারের (রাঃ) নির্দেশ ও হযরত হাফসার (রাঃ) ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন যে, ঐ হুকুম ঐ সময় কার্যকরী হবে যখন যাদুর মধ্যে শিরক যুক্ত শব্দ থাকবে।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় যাদুর অস্তিত্বই মানে না। তারা বলে যে,যারা যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করে তারা কাফির। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যাদুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তারা স্বীকার করে যে, যাদুকর তার যাদুর বলে বাতাসে উড়তে পারে, মানুষকে বাহ্যতঃ গাধা ও গাধাকে বাহ্যতঃ মানুষ করে ফেলতে পারে; কিন্তু নির্দিষ্ট কথাগুলো মন্ত্রতন্ত্র পড়ার সময় ঐগুলো সৃষ্টিকারী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত আকাশকে ও তারকাকে ফলাফল সৃষ্টিকারী মানে না। দার্শনিকেরা, জোতির্বিদেরা এবং বে-দ্বীনেরা তো তারকা ও আকাশকেই ফলাফল সৃষ্টিকারী মেনে থাকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রথম দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ তারা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যাদু করা। তৃতীয় দলীল হচ্ছে ঐ স্ত্রী লোকটির ঘটনা যা হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আরও এ ধরনের বহু ঘটনা রয়েছে।

ইমাম রাযী (রঃ) বলেন যে, যাদু বিদ্যা লাভ করা দুষনীয় নয়। মাসয়ালা বিশ্লেষণকারীগণের এটাই অভিমত। কেননা, এটাও একটা বিদ্যা। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ যারা জানে এবং যারা জানে না, এরা কি সমান?' আর এ জন্যেও যাদু বিদ্যা শিক্ষা দুষণীয় নয় যে, তার দ্বারা মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পূর্ণভাবে পার্থক্য করা যায় এবং মু'জিযার জ্ঞান ওয়াজিব ও ওটা নির্ভর করে যাদু বিদ্যার উপর, যার দ্বারা পার্থক্য বুঝা যায়। সুতরাং যাদু বিদ্যা শিক্ষা করাও ওয়াজিব হয়ে গেল। ইমাম রাযীর (রাঃ) একথা"গোড়া হতে আগা পর্যন্ত ভুল। বিবেক হিসেবে যদি তিনি ওটাকে খারাপ না বলেন তবে মু'তাযিলা সম্প্রদায় বিদ্যমান রয়েছে, যারা ওকে বিবেক হিসেবেও খারাপ বলে থাকে। আর যদি শরীয়তের দিক দিয়ে খারাপ না বলেন তবে কুরআন মাজীদের এ শারঈ আয়াত ওকে খারাপ বলার জন্যে যথেষ্ট। সহীহ হাদীসে রয়ছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কোন যাদুকর বা গণকের নিকট গমন করে সে কাফির হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম রাযীর (র) উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর একথা বলা যে, মুহাককিকগণের অভিমত এটাই' এটাও ঠিক নয়।

মুহাকিকগণের এরূপ কথা কোথায় আছে? ইসলামের ইমামগণের মধ্যে কে এ কথা বলেছেন? অতঃপর যারা জানে এবং জানে না, তারা কি সমান?' এ আয়াতটিকে দলীলরূপে পেশ করা হঠধমী ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, এ আয়াতের 'ইলম এর ভাবার্থ হচ্ছে ধর্মীয় 'ইলম। এ আয়াতে শারঈ আলেমগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর তার এ কথা বলা যে, এর দ্বারা মু'জিযার 'ইলম লাভ হয়, এটা একেবারে বাজে কথা। কেননা, আমাদের রাসূল (সঃ)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হচ্ছে পবিত্র কুরআন, যা বাতিল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু তার মু'জিযা জানা যাদু জানার উপর নির্ভরশীল নয়। ঐ সব লোক যাদের যাদুর সঙ্গে দূরের সম্পর্ক নেই তারাও এটাকে মু'জিযা বলে স্বীকার করেছেন। সাহাবীগণ (রাঃ), তাবেঈগণ, ইমামগণ এমনকি সাধারণ মুসলমানগণও একে মু'জিযা মেনে থাকেন। অথচ তাদের মধ্যে কেউ কখনও যাদু জানা তো দূরের কথা, ওর কাছেই যাননি। তাঁরা ওটা নিজে শিক্ষা করেননি এবং অপরকেও শিক্ষা দেননি। তাঁরা যাদু করেননি এবং করাননি। বরং এসব কাজকে তারা কুফরই বলে এসেছেন। অতঃপর এ দাবী করা যে, মু'জিযা জানা ওয়াজিব এবং যাদু ও মুজিযার মধ্যে পার্থক্য যাদুর উপর নির্ভর করে, সুতরাং যাদু শিখাও ওয়াজিব হলো, এটা কতই না অর্থহীন দাবী! যাদু বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে, যা আবু আব্দিল্লাহ রাফী বর্ণনা করেছেন।

(১) প্রথম যাদু হচ্ছে তারকা পূজকদের। তারা সাতটি গতিশীল তারকার উপর বিশ্বাস রাখে যে, ভাল-মন্দ ওদের কারণেই হয়ে থাকে। এ জন্যে তারা কতকগুলো নির্দিষ্ট শব্দ পাঠ করতঃ ওদের পূজা করে থাকে। এ সম্প্রদায়ের মধ্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগমন করেন এবং হিদায়াত করেন। ইমাম রাযী (রঃ) এ বিষয়ের উপর একটি বিশিষ্ট পুস্তক রচনা করেছেন এবং ওর নাম اَلسِّرُّ الْمَكْتُوْبُ فِىْ مَخَاطِبَةِ الشَّمْسِ وَالنُّجُوْمِ وَالسَّاعَةِ রেখেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, পরে তিনি ওটা হতে তাওবা করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি শুধু জানাবার জন্যে এবং তার এই বিদ্যা প্রকাশ করার জন্যেই এ পুস্তক লিখেছেন, এর প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই। কেননা এটা সরাসরি কুফরী।

(২) দ্বিতীয় যাদু হচ্ছে ধারণা শক্তির উপর বিশ্বাসী লোকদের যাদু। ধারণা ও খেয়ালের বড় রকমের প্রভাব রয়েছে। যেমন একটি সংকীর্ণ সাঁকো মাটির উপর রেখে দিলে

মানুষ অনায়াসেই তার উপর দিয়ে চলতে পারে। কিন্তু এই সংকীর্ণ সঁকোটি যদি নদীর উপর হয় তবে মানুষ আর তার উপর দিয়ে চলতে পারে না। কেননা ধারণা হয় যে, এখনই পড়ে যাবে। ধারণার এই দুর্বলতার কারণেই যেটুকু জায়গার উপর দিয়ে মাটিতে চলতে পারছিল, ঐ জায়গার উপর দিয়েই এরকম ভয়ের সময় চলতে পারে না। এ জন্যেই হেকিমগণ ও ডাক্তারগণ ভীত লোককে লাল জিনিস দেখা হতে বিরত রাখেন এবং মৃগী রোগে আক্রান্ত লোককে খুব বেশী আলোকময় ও দ্রুত গতিসম্প দেখতে নিষেধ করে থাকেন। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উপর ধারণার একটা বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে। জ্ঞানীগণ এ বিষয়েও একমত যে, ন্যর' লেগে থাকে। সহীহ হাদীসেও এসেছে যে, নযর' লাগা সত্য। ভাগ্যের উপর যদি কোন জিনিস প্রাধান্য লাভকারী হতো তবে তা ন্যই ইতো। এখন যদি নাফস্ শক্ত হয় তবে বাহ্যিক সাহায্য ও বাহ্যিক কার্যের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি নাফস ততো শক্ত না হয় তবে ঐ সব যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয়। নাফসের যে পরিমাণ শক্তি বেড়ে যাবে সেই পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি বেড়ে যাবে এবং প্রভাবও বৃদ্ধি পাবে। আর যে পরিমাণ এ শক্তি কম হবে সে পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তিও কমে যাবে।

এ শক্তি কখনও কখনও খাদ্যের স্বল্পতা এবং জনগণের মেলামেশা ত্যাগ করার মাধ্যমেও লাভ হয়ে থাকে। কখনও তো মানুষ এ শক্তির দ্বারা শরীয়ত। অনুযায়ী পুণ্যের কাজ করে থাকে। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'কারামত' বলে, যাদু বলে না। আবার কখনও কখনও মানুষ এ শক্তি দ্বারা বাতিল ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করে থাকে এবং দ্বীন হতে বহু দূরে সরে পড়ে। এ রকম লোকের ঐ অলৌকিক কার্যাবলী দেখে প্রতারিত হয়ে তাকে ওয়ালী বলা কারও উচিত নয়। কেননা, যারা শরীয়তের উল্টো কাজ করে তারা কখনও আল্লাহর ওয়ালী হতে পারে না। তা নাহলে সহীহ হাদীস সমূহে দাজ্জালদেরকে অভিশপ্ত ও দুষ্ট বলা হতো না। অথচ তারা তো বহু অলৌকিক কাজ করে দেখাবে।

(৩) তৃতীয় যাদু হচ্ছে জ্বীন প্রভৃতি পার্থিব আত্মসমূহের দ্বারা সহায্য প্রার্থনা করা। দার্শনিকরা ও মুতাযেলীরা এটা স্বীকার করে না। কতগুলো লোক এসব পার্থিব আত্মার মাধ্যমে কতকগুলো শব্দ ও কার্যের দ্বারা সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে। ওকে মোহমন্ত্র ও প্রেতাত্মার যাদুও বলা হয়।

(৪) চতুর্থ প্রকারের যাদু হচ্ছে ধারণা বদলিয়ে দেয়া, নযরবন্দ করা এবং প্রতারিত করা,যার ফলে প্রকৃত নিয়মের উল্টো কিছু দেখা যায়। কলাকৌশলের মাধ্যমে কার্য

প্রদর্শনকারীকে দেখা যায় যে, সে প্রথমে একটা কাজ আরম্ভ করে, যখন মানুষ একাগ্র চিত্তে ওর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তার প্রতি সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে যায়, তখন তড়িৎ করে সে আর একটি কাজ আরম্ভ করে দেয়, যা মানুষের দৃষ্টির অন্তারলে থেকে যায়। তা দেখে তারা তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। ফিরআউনের যাদুকরদের যাদু এ প্রকারেরই ছিল। এ জন্যেই কুরআন পাকে রয়েছেঃ “তারা মানুষের চোখে যাদু করে দেয় এবং তাদের অন্তরে ভয় বসিয়ে দেয়। অন্য স্থানে রয়েছেঃ মূসার (আঃ) মনে এ ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, ঐ সব লাঠি ও দড়ি যেন সাপ হয়ে চলাফেরা করছে। অথচ এরূপ ছিল না। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন।

(৫) পঞ্চম প্রকারের যাদু হচ্ছে কয়েকটি জিনিসের সংমিশ্রণে একটি জিনিস তৈরী করা এবং এর দ্বারা আশ্চর্যজনক কাজ নেয়া। যেমন, ঘোড়ার আকৃতি তৈরী করে দিল। ওর উপর একজন কৃত্রিম আরোহী বসিয়ে দিল যার হাতে বাদ্য যন্ত্র রয়েছে। এক ঘন্টা অতিবাহিত হতেই ওর মধ্য হতে শব্দ বের হতে লাগল। অথচ কেউই ওকে বাজাচ্ছে না। এরূপভাবেই এমন নিপুণতার সাথে মানুষের ছবি বানালো যে, মনে হচ্ছে যেন প্রকৃত মানুষই হাসছে বা কাঁদছে। ফিরআউনের যাদুকরদের যাদুও এই প্রকারেরই ছিল। তাদের কৃত্রিম সাপগুলো পারদ জাতীয় দ্রব্য দিয়ে তৈরী ছিল বলে মনে হতো যেন জীবিত সাপ নড়াচড়া করছে। ঘড়ি, ঘন্টা এবং ছোট ছোট জিনিস, যা থেকে বড় বড় জিনিস বেরিয়ে আসে, এসবগুলোই এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে একে যাদু বলা উচিত নয়। কেননা, এটা তো এক প্রকার নির্মাণ ও কারিগরি, যার কারণগুলো সম্পূর্ণ প্রকাশ্য। যে ওটা জানে সে এসব শব্দ দ্বারা একাজ করতে পারে। যে ফন্দি বাইতুল মুকাদ্দাসের খৃষ্টানেরা করতো ওটাও এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ঐ ফন্দি এই যে, তারা গোপনে গির্জার প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে দিতো। অতঃপর ওকে গির্জার মাহাত্ম্য বলে প্রচার করতঃ জনগণকে তাদের ধর্মে টেনে আনতো।

কতক কারামিয়াহ ও সুফিয়্যাহ সম্প্রদায়েরও ধারণা এই যে, জনগণকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শনের হাদীসগুলো বানিয়ে নিলে কোন দোষ নেই। কিন্তু এটা চরম ভুল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার নামে মিথ্যা কথা বলে সে যেন দোযখে তার স্থান ঠিক করে নেয়।' তিনি আরও বলেনঃ ‘আমার হাদীসগুলো তোমরা বর্ণনা করতে থাকো; কিন্তু আমার নামে মিথ্যা কথা বলো না। যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলে সে নিঃসন্দেহে জাহান্নামী।'

একজন খ্রীষ্টান পাদরী একদা দেখে যে, পাখীর একটি ছোট বাচ্চা যা উড়তে পারে না, একটি বাসায় বসে আছে। যখন ওটা দুর্বল ও ক্ষীণ স্বর বের করছে তখন অন্যান্য পাখীরা ওর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে যাইতুন ফল এনে ওর বাসায় রেখে দিচ্ছে। ঐ পাদরী কোন জিনিস দিয়ে ঐ আকারেরই একটি পাখী তৈরী করে। ওর নীচের দিক ফাপা রাখে এবং ওর ঠোটের দিকে একটি ছিদ্র রাখে, যার মধ্য দিয়ে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। অতঃপর যখন বাতাস বের হয় তখন ঐ পাখীর মতই শব্দ করে। ওটা নিয়ে গিয়ে সে গির্জার মধ্যে বাতাস মুখো রেখে দেয়। ছাদে একটি ছোট ছিদ্র করে দেয় যেন বাতাস সেখান দিয়ে যাতায়াত করে। এখন যখনই বাতাস বইতে থাকে তখনই ওটা হতে শব্দ বের হতে থাকে। আর এ শব্দ শুনে ঐ প্রকারের পাখী তথায় একত্রিত হয় এবং যাইতুন' ফল এনে এনে রেখে যায়। ঐ পাদরী তখন প্রচার করতে শুরু করে যে, গির্জার মধ্যে এটা এক অলৌকিক ব্যাপার। এখানে একজন মনীষীর সমাধি রয়েছে এবং এটা তাঁরই কারামত। এখন জনগণ স্বচক্ষে এটা দেখে বিশ্বাস করে নেয়। অতঃপর তারা ঐ কবরের উপর ন্যর-নিয়ায আনতে থাকে এবং এই কারামত বহু দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অথচ ওটা না ছিল কারামত, না ছিল মু'জিযা। বরং শুধুমাত্র ছিল ওটা একটা গোপনীয় বিষয় যা সেই পাদরী; একমাত্র তার পেট পূরণের জন্যেই গোপনীয়ভাবে করে রেখেছিল। আর ঐ অভিশপ্ত দল ওতেই লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

(৬) যাদুর ষষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কতকগুলো ওষুধের গোপন কোন বৈশিষ্ঠ্য জেনে ওটা কাজে লাগানো। আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে,এতে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য :রয়েছে। চুম্বককেই তো দেখা যায় যে, ওটা কিভাবে লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকে। অধিকাংশ সূফী ও দরবেশই ঐ ফন্দি ফিকিরকেই জনগণেরই মধ্যে কারামত রূপে প্রদর্শন করতঃ তাদেরকে মুরীদ করতে থাকে।

(৭) সপ্তম প্রকারের যাদু হচ্ছে কারও মধ্যে একটা বিশেষ প্রভাব ফেলে যা চায় তাই তার দ্বারা করিয়ে নেয়া। যেমন তাকে বলে যে, তার "ইসমে আযম . মনে আছে কিংবা জ্বিনেরা তার তাবে আছে। এখন যদি তার সামনে লোকটি দুর্বল ঈমানের লোক হয় এবং অশিক্ষিত হয় তবে তো সে তাকে বিশ্বাস করে নেবে এবং তার প্রতি তার একটা ভয় ও সম্ভ্রম থাকবে যা তাকে আরও দুর্বল করে দেবে। এখন সে যা চাইবে

তাই সে করবে। আর এই প্রভাব সাধারণতঃ স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির উপরই পড়ে থাকে। একেই মুতাবান্নাহ’ বলা হয়। আর অন্তদৃষ্টি দিয়ে সে জ্ঞানী ও অজ্ঞানকে চিনতে পারে, কাজেই সে নিরেটের উপরই তার ক্রিয়া চাপিয়ে থাকে।

(৮) অষ্টম প্রকারের যাদু হচ্ছে চুগলী করা। সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে কারও অন্তরে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং গোপনীয় চতুরতা দ্বারা তাকে বশীভূত করা। এ চুগলী যদি মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির জন্যে হয় তবে এটা শরীয়ত অনুযায়ী হারাম হবে। আর যদি এটা সংশোধন করার উদ্দেশ্যে হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মিলনের জন্যে হয় কিংবা এর ফলে যদি মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি আগত বিপদ থেকে রক্ষা করা যায় এবং কাফিরদের শক্তি নষ্ট করতঃ তাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করা যায় তবে এটা বৈধ হবে। যেমন হাদীস শরীফে আছে যে, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মঙ্গলের জন্যে এদিক ওদিক কথা নিয়ে যায়। হাদীসে আরও আছে যে, যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণার নাম। হযরত নঈম বিন মাসউদ (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে আরবের কাফির ও ইয়াহূদীদের মধ্যে এদিক ওদিকের কথার মাধ্যমে বিচ্ছেদ আনয়ন করেছিলেন এবং এরই ফলে মুসলমানদের নিকট তাদের পরাজয় ঘটেছিল। এটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ইমাম রাযী যে যাদুর এই আটটি প্রকার বর্ণনা ; করেছেন তা শুধু শব্দ হিসেবে। কেননা আরবী ভাষায় سِحْر বা যাদু প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলা হয়, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল হয় এবং যার কারণসমূহ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে। এজন্যেই একটি হাদীসে আছে যে, কোন কোন বর্ণনাও যাদু। আর এ কারণেই সকালের প্রথম ভাগকে ‘সহুর’ বলা হয়। কেননা, ওটা মানুষের চক্ষুর অন্তরালে থাকে। আর ঐ শিরাকের ‘সিহর’ বলে যা আহার্যের স্থানে থাকে। আবু জেহেলও বদরের যুদ্ধে বলেছিল যে, তার খাদ্যের শিরা ভয়ে ফুলে গেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমার সিহর’ ও ‘নাহারের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহলে সিহূরের অর্থ হচ্ছে খাদ্যের শিরা এবং নাহারের অর্থ হচ্ছে বুক। কুরআন পাকে আছেঃ “তারা (যাদুকরেরা) মানুষের চক্ষু থেকে তাদের কার্যাবলী গোপন রেখেছিল। আবু আবদুল্লাহ কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ “আমরা বলি যে, যাদু আছে এবং এও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহকে মঞ্জর হলে তিনি যাদুর সময় যা চান তাই ঘটিয়ে থাকেন। যদিও মুতাযিলা, আবু ইসহাক ইসফিরাঈনী এবং ইমাম শফিঈ (রঃ) এটা বিশ্বাস করেন না।' যাদু কখনও হাতের চালাকি দ্বারাও হয়ে থাকে আবার

কখনও ভোরা, সুতা ইত্যাদির মাধ্যমেও হয়ে থাকে। কখনও আল্লাহর নাম পড়ে ফু দিলেও একটা বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে। কখনও শয়তানের নাম নিয়ে শয়তানী কার্যাবলী দ্বারাও লোক যাদু করে থাকে। কখনও ঔষধ ইত্যাদি দ্বারাও যাদু করা হয়।"রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে বলেছেনঃ কতকগুলো বর্ণনাও যাদু' এর দুটোই ভাবার্থ হতে পারে। হয়তো তিনি এটা বর্ণনাকারীর প্রশংসার জন্যে বলেছেন, কিংবা তার নিন্দে করেও বলে থাকতে পারেন যে, সে তার মিথ্যা কথাকে এমন ভঙ্গিমায় বর্ণনা করছে যে, তা সত্য মনে হচ্ছে।

মন্ত্রী আবুল মুযাফফর ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ বিন হাবীর (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ ‘আল আশরাফু আ'লা মাযাহিবিল আশরাফে’ এর মধ্যে যাদু অধ্যায়ে লিখেছেনঃ এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, যাদুর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এটা স্বীকার করেননি। যারা যাদু শিক্ষা করে ও ওটা ব্যবহার করে তাদেরকে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ), এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) কাফির বলেছেন। ইমাম আবু হানীফার (রঃ) কয়েকজন শিষ্যের মতে যাদু যদি আত্মরক্ষার জন্যে কেউ শিক্ষা করে তবে সে কাফির হবে না। তবে হ, যারা ওর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ওকে উপকারী মনে করে সে কাফির। অনুরূপ ভাবে যারা ধারণা করে যে, শয়তানরা এ কাজ করে থাকে এবং তারা এরকম ক্ষমতা রাখে, তারাও কাফির।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যাদুকরদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, যদি তারা বাবেলবাসীদের মত বিশ্বস রাখে এবং সাতটি গতিশীল তারকাকে প্রভাব সৃষ্টিকারীরূপে বিশ্বাস করে তবে তারা কাফির। আর যদি এ না হয়, কিন্তু যাদুকে বৈধ মনে করে তবে তারাও কাফির। ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রঃ) অভিমত এও আছে যে, যারা যাদু করে এবং ওকে ব্যবহারে লাগায় তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যে পর্যন্ত বারবার না করে কিংবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে নিজে স্বীকার না করে সেই পর্যন্ত হত্যা করা হবে না।

তিনজন ইমামই বলেন যে, তার হত্যা হচ্ছে শাস্তির জন্যে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, এ হত্যা হচ্ছে প্রতিশোধের জন্য। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (রঃ) একটি প্রসিদ্ধ উক্তিতে এ নির্দেশ আছে

যে, যাদুকরকে তাওবাও করানো হবে না এবং তার তাওবা করার ফলে তার শাস্তি লোপ পাবে না।

ইমাম শাফিঈর (রঃ) মতে তার তাওবা গৃহীত হবে। একটি বর্ণনায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলেরও (রঃ) এ উক্তি আছে। ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মতে কিতাবীদের যাদুকরকেও হত্যা করা হবে। কিন্তু অন্যান্য তিনজন ইমামের অভিমত এর উল্টো। লাবীদ বিন আসাম নামক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যাদু করেছিল, কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়নি। যদি কোন মুসলমান মহিলা যাদু করে তবে তার সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মত এই যে, তাকে বন্দী করা হবে। আর অন্যান্য তিনজন ইমামের মতে পুরুষের মত তাকেও হত্যা করা হবে। আল্লাহ তাআলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন।

হযরত যুহরীর (রঃ) মতে মুসলমান যাদুকরকে হত্যা করা হবে,কিন্তু মুশরিক যাদুকরকে হত্যা করা হবে না। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যদি কোন যিম্মীর যাদুর ফলে কেউ মারা যায় তবে যিম্মীকেও মেরে ফেলা হবে। তিনি এটাও বর্ণনা করেন যে, তাকে প্রথমে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা ভালই, নচেৎ তাকে হত্যা করা হবে। আবার তার হতে এও বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণ করলেও তাকে হত্যা করা হবে।
যে যাদুকরের যাদুতে শিরকী শব্দ আছে, চারজন ইমামই তাকে কাফির বলেছেন। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যাদুকরের উপর প্রভুত্ব লাভ করার পর যদি সে তাওবা করে তবে তার তাওবা গৃহীত হবে না। যেমন যিন্দীক সম্প্রদায়। তবে যদি তার উপর প্রভুত্ব লাভের পূর্বেই তারা তাওবা করে তা হলে হবে। আর যদি তার যাদুতে কেউ মারা যায় তবে তো তাকে হত্যা করা হবেই। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যদি সে বলেঃ আমি মেরে ফেলার জন্যে যাদু করিনি। তবে ভুল করে হত্যার অপরাধে তার নিকট হতে জরিমানা আদায় করা হবে। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রঃ) যাদুকরের দ্বারা যাদু উঠিয়ে নিতে অনুমতি দিয়েছেন, যেমন সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে। হযরত আমের শা'বীও এটাকে কোন দোষ মনে করেন না। কিন্তু খাজা হাসান বসরী (রঃ) এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে আরয করেনঃ “আপনি যাদু তুলিয়ে নেন না কেন? তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি লোকের উপর মন্দ খুলিয়ে নিতে ভয় করি।'

যাদুর চিকিৎসা

হযরত অহাব (রঃ) বলেন যে, কুলের সাতটি পাতা পাটায় বেটে পানিতে মিশাতে হবে। অতঃপর আয়াতুল কুরসী পড়ে ওর উপর ফু দিতে হবে এবং যাদুকৃত ব্যক্তিকে তিন ঢাকে পানি পান করাতে হবে এবং অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। এ আমল বিশেষভাবে ঐ ব্যক্তির জন্যে খুবই মঙ্গলজনক যাকে তার স্ত্রী থেকে বিরত রাখা হয়েছে। যাদু ক্রিয়া নষ্ট করার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হচ্ছে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এ সূরাগুলো। হাদীস শরীফে আছে যে, এই সূরাগুলোর চেয়ে বড় রক্ষাকবচ আর কিছু নেই। এরকমই আয়াতুল কুরসীও শয়তানকে দূর করার জন্য বড়ই ফলদায়ক।

(তাফসিরে ইবনে কাসির)

যে মনে করে যে, তার যাদু আল্লাহ্র অনুমতি ও ইচ্ছা বিনা উপকার ও অনিষ্ট সাধন করতে পারে সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৩। রাশিফল ও জ্যেতিষের শিরক রাশিফল বলতে বুঝায় কল্পিত রাশিচক্রে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের প্রভাবে ভূ-মণ্ডলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া বা ঘটনাসমূহের আগাম ভবিষ্যত বানী দেয়াকে। এটা জ্যেতিষবিদ্যা নামে অভিহিত এবং যারা এ বিদ্যায় পারদর্শী তারা জ্যেতিষী নামে পরিচিত। জ্যেতিষীর শির্ক বলতে রাশি-নক্ষত্রের সাহায্যে ভূমণ্ডলে ঘটিতব্য ঘটনাঘটন সমূহের আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করাকে বুঝান হয়। যেমনঃ গ্রহ-ণক্ষত্রের গতি-বিধি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে বৃষ্টিপাত ও ঝড়-বন্যা সহ নানা প্রাকৃতিক ঘটনা ও দুর্যোগের আগাম সংবাদ দেওয়া। জ্যেতিষীরা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে সকল প্রাকৃতিক ঘটনাই তারকারাজীর প্রভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমনঃ বৃষ্টিপাত, বন্যা, শীত, গরম, মহামারী বা যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি সব কিছুই তারকার প্রভাবে ঘটে থাকে। তাই জ্যেতির্বিদগণ এ সম্পর্কে অগ্রিম বার্তা প্রদান করতে সক্ষম। কিন্তু একজন তাওহীদবাদী মুসলিম জ্যেতিষে বিশ্বাস করে না। বস্তুতঃ রাশিফলের কোন ভিত্তিও নেই।

আল্লাহ্র সাথে অন্যকে জুড়ে নিয়ে কথা বলার শির্ক আমাদের সমাজে এমন কিছু কথার প্রচলন দেখা যায় যেখানে আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন সত্তার নাম জুড়ে কোন বিষয় উপস্থাপন করা হয়। যেমন- “আল্লাহ্ এবং আপনি না হলে আমার সবই ধ্বংস হয়ে যেত” আবার কেমন

আছেন? প্রশ্ন করলে এর উত্তরে প্রায়শঃই মানুষকে এরূপ বলতে শোনা যায় "আল্লাহ্ এবং আপনি যেমন চেয়েছেন" ইত্যাদি। উল্লিখিত বাক্য দু'টোতে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে অংশী স্থাপন করা হয়েছে, সুতরাং এ ধরনের কথা-বার্তা শিরক। এখানে 'এবং' শব্দটির মধ্যে সমকক্ষতার গন্ধ আছে। তবে 'এবং' এর পরিবর্তে যদি অন্য শব্দ ব্যাবহার করা যায়, যেমন 'অতঃপর', 'এরপর' ইত্যাদি, তাহলে এ শির্ক থেকে মুক্ত থাকা যায়। যেমন "আল্লাহ্ অতঃপর আপনি যেমন চেয়েছেন" এখানে 'এবং' এর যায়গায় 'অতঃপর' শব্দটি ব্যাবহারের ফলে এর দ্বারা সমকক্ষতা প্রকাশ পায় না। তবে সবথেকে নিরাপদ হচ্ছে এই যে, কারো নাম না জড়িয়ে এভাবে বলা যে, 'আল্লাহ্ একাই যা চান'। এ সম্পর্কে একটি হাদিস উপস্থাপন করা যায়। সহীহ হাদিসে বর্নিত আছে, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলল, "যা আল্লাহ্ চান ও রাসূলুল্লাহ (সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চান।" তিনি বললেন, "তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র অংশীদার করছ? একথা বল-যা আল্লাহ্ একাই চান।" তফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড-পৃষ্ঠা ১৮৮,১৮৯

মুসলিমদের মাঝে এ জাতীয় বাক্য ব্যবহারর আরো অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। যেমন: আমার জন্য শুধু আল্লাহ্ এবং আপনি রয়েছেন। আমি আল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ (সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) - এর উপর নির্ভর করি।এটি আল্লাহ্ এবং আপনার বরকতেই হয়েছে। ঙ আমি আল্লাহ্র নিকট এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করি। ঙ আমার জন্য উপরে আছেন আল্লাহ্ আর নিচে আছেন আপনি। উল্লিখিত বাক্যগুলিতে 'এবং' ও 'আর' শব্দ দু'টি সংযোগ স্থাপন কারী শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আল্লাহ্র সাথে অন্যের শরীক স্থাপন কারী বাক্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন আগেই বলা হয়েছে যে, এ শব্দ দু'টোর পরিবর্তে যখন 'অতঃপর' বা 'এরপর' ব্যবহার করা হয় তখন সে ভয় থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং শির্ক থেকেও বাঁচা যায়। এর স্বপক্ষে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ শপথ করে, সে যেন এমন না বলেঃ আল্লাহ্ যা চান এবং তুমি যা চাও, বরং সে যেন বলেঃ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, এরপর তুমি যা চাও।" হাদিস, ইবনে মাজাহ, নং ২১১৭ সুতরাং আমরা আমাদের দৈনন্দিন আচরণে ও কথা-বার্তায় এ ধরনের সূক্ষ্ম ভুল গুলোকে হাদিসের আলোকে শুধরে নেওয়ার প্রচেষ্টা করব আর একমাত্র আল্লাহ্র উপরে ভরসা করব এবং তাঁর নিকটেই সাহায্য কামনা করব।

(শিরক – ড. মোঃ সেলিম রেজা)

ছোট শির্কের ভয়াবহতা

*মহান আল্লাহ বলেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٢٦٤

হে ঈমানদারগণ! দানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে সে ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে, অথচ সে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়। তার তুলনা সেই মসৃণ পাথরের মত, যাতে সামান্য কিছু মাটি আছে, অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে ফেলে। তারা স্বীয় কৃত কার্যের ফল কিছুই পাবে না; আল্লাহ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।

(সুরা বাকারা, আয়াত-২৬৪)

আল্লাহ তাআলা তার ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন যারা দান-খয়রাত করে থাকেন; অতঃপর যাদেরকে দান করেন তাদের নিকট নিজেদের কৃপার কথা প্রকাশ করে না এবং তাদের নিকট হতে কিছু উপকারেরও আশা করে না। তারা তাদের কথা ও কাজ দ্বারা দান গ্রহীতাদেরকে কোন প্রকারের কষ্টও দেয় না। মহান আল্লাহ তাঁর এই বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদানের ওয়াদা করেছেন যে, তাদের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুখ দিয়ে উত্তম কথা বের করা, কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্যে প্রার্থনা করা, দোষী ও অপরাধীদের ক্ষমা করে দেয়া ঐ দান-খয়রাত হতে উত্তম, যার পিছনে থাকে ক্লেশ ও কষ্ট প্রদান। ইবনে আবি হাতিমের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “উত্তম কথা হতে ভাল দান আর কিছু নেই। তোমরা কি মহান আল্লাহর قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى অর্থাৎ যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ দান সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর’ (২:২৬৩) এই ঘোষণা শুননি: আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণ হতে অমুখাপেক্ষী এবং সমস্ত সৃষ্টজীব তারই মুখাপেক্ষী। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু। বান্দার পাপ দেখেও ক্ষমা করে থাকেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে , রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন প্রকার লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না ও তাদেরকে পবিত্র করবেন না। বরং তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে দান করার পর কৃপা প্রকাশ করে থাকে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে পায়জামাকা লুঙ্গী পায়ের গোছার নীচে লটকিয়ে রাখে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ

ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য দ্রব্য বিক্রি করে থাকে। সুনান-ই- ইবনে মাজাহ্ প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ বাপ-মার অবাধ্য, সাদকা করে কৃপা প্রকাশকারী, মদ্যপায়ী এবং তকদীরকে অবিশ্বাসকারী বেহেশতে প্রবেশ লাভ করবে না। সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যে রয়েছে, রাসূলুয়াহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাতও করবেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য, মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী। নাসাঈর অন্য হাদীসে রয়েছে যে,ঐ তিন ব্যক্তি (প্রাগুক্ত তিন ব্যক্তি) বেহেশতে প্রবেশ করবে না, এই জন্যেই এই আয়াতেও ইরশাদ হচ্ছেঃ অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-খয়রাত নষ্ট করো না। এ অনুগ্রহ প্রকাশ ও কষ্ট দেয়ার পাপ দানের পুণ্য অবশিষ্ট রাখে না। অতঃপর অনুগ্রহ প্রকাশকারী ও কষ্ট প্রদানকারীর সাদকা নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপমা ঐ সাদকার সাথে দেয়া হয়েছে, যা মানুষকে দেখাবার জন্যে দেয়া হয় এবং উদ্দেশ্য থাকে যে, মানুষ তাকে দানশীল উপাধিতে ভূষিত করবে ও দেশে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য তার মোটেই থাকে না এবং সে পুণ্য লাভেরও আশা পোষণ করে না। এই জন্যেই এই বাক্যের পর বলেছেন যদি আল্লাহ তা'আলার উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস না থাকে তবে ঐ লোক-দেখানো দান, অনুগ্রহ প্রকাশ করার দান এবং কষ্ট দেয়ার দানের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তর খণ্ড, যার উপরে কিছু মাটিও জমে গেছে। অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত ধুয়ে গেছে এবং কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই দু' প্রকার ব্যক্তির দানের অবস্থাও দ্রুপ। লোকে মনে করে যে, সে দানের পুণ্য অবশ্যই পেয়ে যাবে। যেভাবে এই পাথরের মাটি দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঐ মাটি দূর হয়ে গেছে, তেমনই এই ব্যক্তির অনুগ্রহ প্রকাশ করা ও কষ্ট দেয়ার ফলে এবং ঐ ব্যক্তির রিয়াকারীর ফলে ঐ সব পুণ্য বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ পাকের নিকট পৌছে তারা কোন প্রতিদান পাবে না। আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

(তাফসিরে ইবনে কাসির)

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের উপর আমার যে জন্য ভয় হয়, তা হচ্ছে ছোট শির্‌ক" সাহাবাগণ জিজ্ঞাস করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসুল, ছোট শির্‌ক কি?" তিনি উত্তরে বললেন, 'রিয়া'। প্রতিফল দিবসে আল্লাহ্ যখন তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিদান দেবেন, সেদিন তিনি তাদেরকে বলবেন, পৃথিবীতে যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা নেক আমল করতে, তাদের কাছে যাও। দেখ প্রতিদান পাও কিনা।" হাদিস, মুসনাদে আহম্মদ, নং ২৭৭৪২

মুহাম্মদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাহির হয়ে বললেন, "হে লোক সকল! গোপন শিরক থেকে সাবধান থাকো" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! গোপণ শির্ক কি?" তিনি বললেন, "যখন একজন মানুষ সালাতে দাঁড়ায় এবং খুব আগ্রহ সহকারে সুন্দরভাবে সালাত আদায় করে, কারণ মানুষ তার সালাতকে দেখছে, সেটা গোপণ শিরক।" হাদিস, মুসনাদে আহম্মদ

"হে লোক সকল! তোমরা গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকো! কেননা এটাতো অন্ধকার রাত্রে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ার চলাচলের চেয়েও গোপনীয় ও সুক্ষ্ম।" তফসীর ইবনে কাসীর, ১২ খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা

*মহান আল্লাহ বলেন-

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيۡطَٰنُ لَهُۥ قَرِينٗا فَسَآءَ قَرِينٗا ٣٨

"(আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না) যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আর শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয় তাহলে সে নিকৃষ্ট সাথীই বটে।"

(সুরা নিসা, আয়াত-৩৮)

এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শির্ক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সদকা করল সে শির্ক করল।' [মুসনাদে ত্বায়ালেসী ১১২০, মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৩৬৫]

উপসংহার

একজন মুসলিমের উপর কর্তব্য ছোট শির্ক বা বড় শির্ক সকল শির্কের ব্যাপারে সাবধান থাকা। কেননা শির্ক হচ্ছে- আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা, তাঁর অধিকারে সীমালঙ্ঘন করা। আল্লাহ্‌র অধিকার হচ্ছে- নিরঙ্কুশভাবে তার ইবাদত করা। আল্লাহ্‌ তাআলা মুশরিকদের জন্য স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকাকে আবশ্যক করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً

النساء / 48

(নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর চেয়ে লঘু গুনাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে সে মহা পাপে লিপ্ত হয়।)

[সূরা নিসা, আয়াত: ৪৮]

তিনি আরও বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ المائدة

(নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে আল্লাহ্‌ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। জাহান্নামই তার আবাসস্থল। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।)[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৭২]

তাই প্রত্যেক আকলবান ও দ্বীনদার ব্যক্তির উপর আবশ্যক নিজের ব্যাপারে শির্কে লিপ্ত হওয়াকে ভয় করা এবং নিজের প্রভুর কাছে শির্ক থেকে মুক্ত থাকার জন্য দোয়া করা যেমনিভাবে ইব্রাহিম (আঃ) দোয়া করে বলেছেন:

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ إبراهيم / 35

আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচান)[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৩৫] এজন্য জনৈক সলফে সালেহীন বলতেন: "ইব্রাহিম আলাইহি সালামের পর আর কোন ব্যক্তি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে।" তাই একজন বিশ্বস্ত বান্দা শির্ককে ভয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং তার প্রভুর কাছে তার তীব্র আগ্রহ হবে তিনি যেন তাকে শির্ক থেকে মুক্ত রাখেন। বান্দা ঐ সুমহান দোয়াটি করতে থাকবে যে দোয়া নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم (হে আল্লাহ্! জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এবং অজ্ঞাতসারে করে ফেললে ক্ষমা চাচ্ছি।)

[আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৩৭৩১) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

বড় শির্ক ও ছোট শির্ক দুটোর হুকুমগত পার্থক্য হচ্ছে:

বড় শির্ক ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির উপর ইসলাম ত্যাগ ও মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয় এবং সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, ছোট শির্ক ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না। বরং কখনও কখনও কোন মুসলিম ছোট শির্কে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। তবুও সে ইসলামের উপরেই থাকবে। তবে ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি ভয়াবহ শংকার মধ্যে রয়েছে। কেননা ছোট শির্ক কবিরা গুনাহ। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: “আমি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে অন্য কোন সত্তার নামে সত্য শপথ করার চেয়ে অধিক প্রিয়।” তিনি অন্য কোন সত্তার নামে শপথ করাকে (যেটা হচ্ছে ছোট শির্ক) আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করার চেয়ে জঘন্য নির্ধারণ করেছেন। অথচ এটি সুবিদিত যে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করা কবিরা গুনাহ।

(www.islamqa.info)

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের অন্তরগুলোকে তাঁর দ্বীনের উপর অবিচল রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি তিনি যেন, আমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করেন। নিশ্চয় তিনি চিরঞ্জীব; যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না; জ্বিন ও ইনসান মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ ও সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন।